[ঢাকা মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র]

(বার্ষিকী)

শিখা

দ্বিতীয় বর্ষ

সম্পাদক—

কাজী মোতাহার হোসেন এম, এ

—অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশক—

সৈয়দ ইমামুল হোসেন

ম্যানেজার—মডার্ণ লাইব্রেরী

৭৪নং নবাবপুর, ঢাকা

(প্রথম সংস্করণ)

১৯২৮

মূল্য ৷৹ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

মডার্ণ লাইব্রেরী

৭৪নং নবাবপুর রোড, ঢাকা

ঢাকা সাতরাওজা ইসলামিয়া প্রেসে—

মুন্সি আহাম্মদ আলী দ্বারা মুদ্রিত

'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মুখপত্র

(বার্ষিকী)

শিখা

সম্পাদক—

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম.এ.

নিবেদন

অতীব পরিতাপের বিষয় যে, দ্বিতীয় বর্ষের 'শিখা' প্রকাশ করিতে বহু বিলম্ব ঘটিয়া গেল। যে সমস্ত কারণে এই বিলম্ব ঘটিয়াছে তাহা বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আশা করা যায় ভবিষ্যতে আমরা ক্রমশঃ ঐ সমস্ত কারণ দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিব।

এই বৎসরের "শিখা" প্রকাশ করিতে যাঁহারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান আবদুল কাদের ও সাহিত্যরত্ন আবদুল মজিদের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রেসের কাজে প্রুফ দেখা ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে এবার "শিখা" প্রকাশ করা অসম্ভব হইত। এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ও সমাজের তরফ হইতে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আর একটী বিষয় উল্লেখ করিয়াই শেষ করি। সেটী হইতেছে 'ছাপার ভুল'। এজন্য আমরা বড়ই লজ্জিত। কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে এই ত্রুটী দূর করিতে পারি নাই। সেজন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আশা করি 'শিখা'র জন্ম ও বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা কথঞ্চিৎ পরিচিত তাঁহারা আমাদের এই ত্রুটীর জন্য সহানুভূতি করিতে পারিবেন।

এবারকার 'শিখা'র জন্য যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেকগুলি জাগরণ ও সওগাতে পত্রস্থ করা হইয়াছে। অর্থ ও সময় অভাবে শিখাতে সেগুলির স্থান দিতে না পারিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত; আশা করি, লেখকগণ সেজন্য মনঃক্ষুন্ন হইবেন না বরং ভবিষ্যতেও তাহারা তাঁহাদের পূর্ব্ববৎ সহানুভূতি দ্বারা শিখাকে সার্থক করিয়া তুলিতে যত্নবান হইবেন। ইতি—

সম্পাদক

দ্বিতীয় বর্ষের কর্ম্মী-সংসদ

আবদুস্ সালাম খাঁ বি-এ

এ, এম, তাহেরুদ্দীন এম-এ

বিলায়েৎ আলী খাঁ বি এ

খান মুহম্মদ আতাউর রহমান

মৌঃ গোলাম আহাম্মদ

আবদুল কাদের

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি-টি (সহকারী সম্পাদক)

কাজী মোতাহার হোসেন এম-এ (সম্পাদক)

সূচীপত্র

শিখায় অপ্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা *

(১) মুর নির্ব্বাসন—মৌঃ আবদুর রসিদ বি টি — সওগাতে প্রকাশিত

(২) প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান—মিসেস ফাতেমা খানুম— জাগরণে ,,

(৩) নারীর কথা—খুরশীদ জাহাঁ বেগম — ,, ,,

(৪) বাংলায় পীর পূজা—মৌঃ মোসলেম উদ্দীন খাঁ — ,, ,,

(৫) কৃষি সমস্যা—মৌঃ আনোয়ার হুসেন —জাগরণ ও প্রবাসীতে উদ্ধৃত

(৬) ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ ২য় অংশ — মৌঃ আনোয়ার-উল কাদের এম এ, বি এল. বি টি, বি-ই এস —জাগরণে প্রকাশ্য।

(৭) মানব ও ইসলাম—মৌঃ শিরাজুল ইসলাম —জাগরণে প্রকাশিত

*উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি "মুসলিম সাহিত্য সমাজের" দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল। (সঃ)

শুদ্ধিপত্র

[বানান ভুল ছাড়া অন্যান্য ভুলের মধ্যে খুব মোটামুটিগুলি দেওয়া গেল—সঃ শিঃ]

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	গগণে	গগনে
৫	১৬	যে, সমাজের	যে, এই সমাজের
৬	২২	যখন	তখন
৭	১২	সাহিত্যে	সাহিত্য
৮	২১	থাকিতেও	থাকিলেও
৮	২২	তাহাদের	উহার
১২	২	মানস	মানব
১২	১৫	বাড়িতেছে	হইয়াছে
১৪	১৯	উপযোগ্য	উপযোগী
১৫	১৫	দেখিলেই	দেখিলে
২২	২২	ভাস্কর	ভাস্বর
৩৭	৩	শান্তিশয় প্রিয়	সম্মানার্হ
৩৭	২৭	আকরবা	আকবা
৪০	৯	আকার	আচার
৪১	২৯	যথার্থ নিদর্শন	এক বড় অঙ্গ
৪২	১	هده دا عدل ;	ز ا هده عزر
৪৩	১৯	কুনকেন মোমেনীন আয়সোল্লাহু	কুলুফুল্ মোমেনীন আরশুল্লাহ
৯৯	১	decoratire	The Arabs were not the semites and such were not the race of original thought in building decorative.

দ্রষ্টব্য। দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে এ ছাড়া আরো অনেক ভুল রয়েছে: যদি 'শিখা'র প্রবন্ধ সম্ভার দেখে সুধীমণ্ডলী ইহার আদর করেন আর তজ্জন্য যদি ইহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করবার প্রয়োজন হয় তাহলে এ সমস্ত ত্রুটী যথাসাধ্য দূর করবার চেষ্টা করব।—সঃ শিঃ

"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।"

নতুনের গান*

—নজরুল ইস্‌লাম

(কোরাস্)
চল্‌ চল্‌ চল্‌!
ঊর্দ্ধ-গগণে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী তল,
অরুণ-প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির-রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

"তাজা-ব-তাজার" গাহিয়া গান
সজীব করিব গোরস্থান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

* দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত।—সঃ

কোরাস্ ঃ—

উর্দ্ধে আদেশ হানিছে বাজ
শহিদী-ঈদের সেনারা সাজ্
দিকে দিকে চলে কুচ্‌কাওয়াজ
খোল্‌রে নিঁদ-মহল।

চল্‌রে নৌজোয়ান—
শোন্‌রে পাতিয়া কান
নয়া জমানার মিনারে মিনারে
নব উষার আজান!

ভাঙ্‌রে ভাঙ্ আগল!
চল্‌রে চল্‌রে চল্

কবে সে খেয়ালি বাদ্‌শাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস্ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্ অশ্রুজল।

যাক্‌রে তখ্‌ত্ তাউস
জাগ্‌রে জাগ্ বেহুস,
ডুবিলরে দেখ্ রোম গ্রীক্
কত পারশ্য রুষ।
জাগিল পুনঃ সকল।

আমরা রচিব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল
চল্‌রে চল্‌রে চল্॥

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

শ্রদ্ধেয় সমবেত ভদ্রমণ্ডলী

আজ আপনারা আপনাদের সাহিত্য-সমাজের অতিথিগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের সঙ্গে আমার দিলখুলে মিলামিশা করার অসুবিধা ঢের। আমার মাতৃভাষা বাংলা নয়; তাই বাধ্য হয়ে আজ আমাকে বিদেশী ভাষায় আপনাদের আহবান করতে হচ্ছে। এর জন্য ত্রুটী আপনারা মা'ফ করে নেবেন।

মাতৃভাষার চর্চ্চা না করলে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। মানুষের কর্ম্মশক্তি বাড়ে মনের শক্তি বাড়লে। অচল মন কর্ম্ম-পদ্ধতি স্থির করতে অক্ষম। নিসাড়মনবিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে নিকৃষ্ট পশুর কোনো প্রভেদ নাই। কারণ উভয়েরই জীবন গতানুগতিক ও সংকীর্ণ পথে নিয়ন্ত্রিত। কোন পরিবর্ত্তন তাদের জীবনে দেখা যায় না। মন সচল না হলে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে না। অবস্থার পরিবর্ত্তনই সভ্যতা। এই মনকে সচল করে সাহিত্য। আবার সাহিত্য সৃষ্টি হয় সচল মন দ্বারা। একে অপরের উপর নির্ভর করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মনকে সচল করতে হলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া চাই এবং মাতৃভাষায় সাহিত্য হওয়া চাই। আমি আলিগড় Education conferenceএ এ-কথা জোর করেই বলেছিলাম। বাংলা দেশে জোর করে উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করতে চাওয়ার মত আহাম্মকি আর নাই। আপনারা মাতৃভাষার চর্চ্চায় মন দিয়েছেন এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলার মুসলমান এতদিন অনর্থক উর্দ্দুর পিছু পিছু ছুটে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই আজ তারা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত। অবাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চ্চা চলে এসেছে বলে তাদের মন মুক্ত এবং তারা তাদের জীবনটীকে উপভোগ করে। শিক্ষাও তাদের মধ্যে অনেক প্রসার লাভ করেছে। সেজন্য সংখ্যায় লঘু হলেও সে সমস্ত মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে টেক্কা দিতে পারছে। কারণ তাদের শিক্ষা মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার্থীর অনেককেই উর্দ্দু জোর করেই কণ্ঠস্থ করতে হয় মাতৃভাষাকে অবহেলা করে। আনন্দের বিষয়, যে আজকাল উর্দ্দুর নেশা ঢের কেটেছে। আমার মনে হয়, এইবার বাংলার মুসলমান তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারবে। এই উন্নতি আরও দ্রুত হোক, এই প্রার্থনা করি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আজকার এই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির

আসন অলঙ্কৃত করার কথা ছিল সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল খান বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ মুসা সাহেবের। পরিতাপের বিষয়, তিনি কাজের ভিড়ে আজ এই সভায় উপস্থিত হতে পারেন নাই। তাই তাঁর এই আসনে আমার মত অযোগ্য অর্ব্বাচীনকে বসিয়ে আপনারা আমাকে বিশেষ লজ্জিত করেছেন। আপনাদের আদেশ আমি পালন করতে বাধ্য।

অবশেষে আমি আমাদের আজকার সাধারণ সভাপতি সাহেবকে তাঁর গুরুভার গ্রহণ করে এই অধিবেশনের কার্য্য সমাধা করতে আহবান করি—এবং আপনাদের নিকট আমার অযোগ্যতা ও অর্ব্বাচীনতার জন্য মাফ চাই। আপনারা নির্ব্বিঘ্নে ধীর স্থিরচিত্তে বাংলার মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করুন এই কামনা করি।

"বহুকাল সাধনা ক'রে খোদার রহমতের কণিকা লাভ করতে হয়। আজীবন ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সহিত বার বার ব্যর্থ হয়েও যে না-উম্মেদ হয় না সেই-ই তাঁর অপার স্নেহের সম্পদ লাভ করে ধন্য হয়। আন্তরিক প্রার্থনাই সে সাধনার প্রাণ। কিন্তু আজ ধৈর্য্য ও আন্তরিকতা এ দুই-ই আমাদের সমাজে মারাত্মকভাবে দুর্লভ হয়েছে"— আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি —কোরাণের অমর উপদেশ

يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر و الصلوة ط

(সুরা বাক'র, আয়াত ১৫৩) * ان الله مع الصبرين

—সঃ

---

* এটি সহকারী সভাপতি সাহেবের ইংরাজী বক্তৃতার সার। খান বাহাদুর মুহম্মদ মুসা সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। পরে চিঠি পত্র বিলি হয়ে গেলে অধিবেশনের ৪ দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। অগত্যা সহকারী সভাপতি মিঃ মাহমুদ হাসান, M. A. (Cal.) B. A (Oxon), মুস্লিমহলের অস্থায়ী প্রভোষ্টকে সভাপতির কার্য্য করতে হয়েছিল।—সঃ

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহাস্পদ বন্ধুগণ,

ভূমিকা

আপনারা আমাকে আপনাদের সাহিত্য সমাজের সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আমাকে অপ্রত্যাশিত সম্মান দেখাইয়াছেন। তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাদের নির্ব্বাচন বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। যে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার আপনারা আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সভাপতির অভিভাষণে নিরাশ হইবেন। কিন্তু তজ্জন্য দায়ী আমি নহি। বারবার অক্ষমতার অজুহাত পেশ করিয়াও আমি নিষ্কৃতি পাই নাই। আপনারা আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া থাকেন; আপনাদের আহ্বান আমার শিরোধার্য্য। তাই অগত্যা কম্পিত অন্তঃকরণে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। যে স্থলে আন্তরিক স্নেহ বিদ্যমান, তথায় দোষত্রুটি সহজেই মার্জ্জিত হয়। আশা করি, আপনারাও আমার ভুল ভ্রান্তি মাফ্ করিয়া লইবেন।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যেই ইহা আপনাকে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। উহার কার্য্যবিবরণী ও প্রবন্ধ সমূহ সমাজের মুখপত্র 'শিখায়' প্রকাশিত হইয়াছে। 'শিখা' সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়াছে। এই সমস্ত সমালোচনা হইতে আর যাহাই পাওয়া যাউক না কেন, এই কথাটী বেশ স্পষ্টরূপে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে যে, সমাজের কর্ম্মিগণ এক নূতন উৎসাহে উৎসাহিত, এক নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। ইঁহারা সমাজ-গত-প্রাণ। মুসলিম সমাজের বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্য ইঁহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। ইঁহারা উহাকে সঞ্জীবিত ও সর্ব্বগুণে বিভূষিত করিয়া বিশ্বের দরবারে একটী গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সকল জাতির নিকট শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতে চান। ইহারা সত্যান্বেষী; গতানুগতিক সহজ ব্যাখ্যায় ইঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। সত্যকে ইহারা শুধু মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান না। ইঁহারা চান সে সত্যকে বুদ্ধির মাপ কাঠি দ্বারা ভাল করিয়া যাচাই করিয়া আপনার করিয়া লইতে। ইঁহারা স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা অকপটে নির্ভীকচিত্তে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। সত্যান্বেষণের ইহাই একমাত্র পথ। সকল সত্যের আধার পরম কারুণিক খোদাতা'লা ইহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করুন এবং ইহাদের চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত করুন, ইহাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

সাহিত্যের স্বরূপ

আমি সাহিত্যিক নহি। সাহিত্যের স্বরূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। একজন সামান্য শিক্ষিত লোক হিসাবে আমার সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহাই নিতান্ত সাদাসিদা ভাবে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। সাহিত্যকে জীবনের সমালোচনা বলা হয়। পারিপার্শ্বিক জীবনে যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূত হয় তাহাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই ঘটনা গুলি সাধারণের অনুভূতিতে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, সাহিত্যে তাহার অবিকল ছবি ফুটিয়া উঠে না। সাহিত্যিকের অন্তর দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া উহা নূতন রঙে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়। যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূত হয় তাহা ঘটনা মাত্র। আর সাহিত্যিকের মন উহাকে ছাঁকিয়া সাহিত্যে যাহা প্রকাশ করে তাহাই সত্য। এই সত্যই প্রকৃত সাহিত্যের পরিচায়ক। ইহাতেই সাহিত্যিকের আত্ম-প্রকাশ হয়।

সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য দুইটী জিনিষ আবশ্যক ;—পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাহিত্যিকের মন। এই দুইটী পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। প্রথমটীর উপর দ্বিতীয়টী অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যখনই কোন বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হয়, কোন স্থিতিশীল অনুষ্ঠানের মধ্যে গতি বা বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই সাহিত্যিকের মন প্রচণ্ড আঘাতে উন্মুক্ত ও প্রসারিত হয় এবং প্রাণস্পর্শী সাহিত্যের সৃষ্টি করে। ইউরোপের সাহিত্যে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইউরোপে লোকের মন এরূপ সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, একমাত্র বাইবেল গ্রন্থ ভিন্ন তাহাদের আলোচনার বিষয় আর কিছুই ছিল না। তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কনষ্টাণ্টিনোপলের পতনে বহু সংখ্যক বিদ্যার্থী ইটালীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে ইউরোপ এক নূতন আলোক ও চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং ফলে তাহার সাহিত্যের পুনরুত্থান হয়। ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ এলিজাবেথীয় যুগ। সে যুগের সাহিত্যের মূলেও একটা প্রচণ্ড নূতন আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড যখন কল কারখানার আবিষ্কার দ্বারা প্রকৃতির উপর বিপুল প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছিল। নূতন আবিষ্কার ও পর্য্যটনের ফলে বহু দেশের বহু অভিজ্ঞতা তখন তাহার সাহিত্যিকের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, যখন কোন জাতির মধ্যে একটা নূতন আলোক প্রবেশ করে, তখন তাহাদের জ্ঞান ও কল্পনার পরিধি সহসা বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এক কথায়, যখন তাহাদের জীবনে একটা নূতন স্ফূর্ত্তি অনুভূত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

মুসলিম সাহিত্যের মূলেও ঐ একই কথা। হজরত মুহম্মদের সাধনা আরবী সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ইস্‌লামের প্রভাবে প্রাচীন চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। মোতাজেলা, সুফী চিন্তাধারা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তৎকালীন আরবী ও পারস্য চিন্তাধারা ইস্‌লামের তৌহীদের মন্ত্রে কেমন করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া এক নূতন পথে গতিলাভ করিয়াছিল। প্রাথমিক মুস্‌লিম সমাজে বিভিন্ন ইমামের চিন্তাধারা লক্ষ্য করিলেও এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে নবভাবের আবির্ভাব হইলে মানুষের মন গা ঝাড়া দিয়া

উঠে এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সাহিত্য মানব মনের পুষ্প। বড় বড় শাস্ত্রগ্রন্থ, বড় বড় কাব্য, বৈজ্ঞানিক তথ্য, দার্শনিক সত্য সমস্তই মানুষের উৎকর্ষসমন্বিতচিত্ত ও সম্প্রসারিত মার্জিত মস্তিষ্কের ফল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে সে মন বিকশিত হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় দার্শনিক সত্য মানুষের দুঃস্থ অনুন্নত সমাজের মহাপুরুষদের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়াছে। ইউরোপে যে সমস্ত দার্শনিক সূত্র প্রচলিত হইয়াছে তাহার মূলে অনুভূতির বহ্নিতে প্রজ্জলিত চিত্ত বিদ্যমান। বেনথাম, মিল্ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বার্গস, কহ্‌নার প্রমুখ দার্শনিক সমাজের প্রসব-বেদনার ফল। আবার ভারতীয় আধুনিক জাগরণের মূলে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক দুরবস্থা। সেই দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য যে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে—তাঁহারাই সাহিত্যের আধুনিক স্রষ্টা। বাংলাদেশে রামমোহনের যুগ, বঙ্কিম চন্দ্রের এবং রবীন্দ্র নাথের যুগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—প্রত্যেক যুগের এক একটা বিশিষ্ট সমস্যা সাহিত্যের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের অজ্ঞাতে সমস্যা জন্মলাভ করে—আর সাহিতে তাহার রূপ গ্রহণ করে এবং সমাধানের ইঙ্গিত করে। যে সমাজে সমস্যা যত কম, সে সমাজে সাহিত্যের বৈচিত্র্য তত কম। বাংলার আধুনিক মুসলমানের সাহিত্য নাই। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও পুঁথি সাহিত্যের একটা চমৎকার প্রভাব বাংলার মুস্‌লিম সমাজের উপর বিদ্যমান ছিল—কিন্তু আজ তাহাও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে। আজ চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র যেন ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের জীবনে যেন কোন সমস্যাই নাই। তাহার কারণ, আমরা একটা কৃত্রিম ভাব ধারার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছি। আমাদের আলেম সম্প্রদায় উর্দ্দুকে আমাদের ধর্ম্ম ভাষায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন এবং আমরা উর্দ্দুকে মাতৃ ভাষার উপরে স্থান দিয়া মাতৃ ভাষার উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সেই জন্যই বোধ হয় আমাদের জীবনের আনন্দ ও স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তি রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। নতুবা আমার মনে হয় পুঁথি সাহিত্য ক্রম বিকাশ লাভ করিয়া আজ এক নূতনরূপ লইয়া আমাদের সাহিত্যের অভাব পূরণ করিত।

সাহিত্যের ভাষা

সাহিত্যের বাহন ভাষা। বঙ্গীয় মুস্‌লিম সাহিত্যের ভাষা কি হইবে তাহা লইয়া আজ মাথা ঘামাইয়া সময় নষ্ট করিতে যাওয়া নিরর্থক বিড়ম্বনা বৈ আর কি হইতে পারে? ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই বঙ্গ-ভাষা-ভাষী, সুতরাং তাহাদের সাহিত্যের ভাষা যে বাংলা হইবে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তথাপি যে কোন কোন মুসলমান বাংলাকে তাহাদের সাহিত্যের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ, তাহার বোধ হয় একটা কারণ আছে। বাংলা ভাষায় তাহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটে না; তাঁহারা সাহিত্যে যাহা প্রত্যাশা করেন, বাংলায় তাহা পান না, এটা অতি দুঃখের বিষয় এবং এই দুঃখেই তাঁহারা বাংলাকে অস্বীকার করিয়া চলিতে চান। কিন্তু তাহা নিষ্ফল। বাংলাকেই বাঙালী মুসলমানের

মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাতেই তাহার সাহিত্য প্রকাশ করিতে হইবে। বাংলাকে অস্বীকার করিয়াই আমরা আজ সাহিত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় উর্দ্দুতে বাৎচিৎ করিয়া শরাফত বহাল করিবার জন্ম উদ্বিগ্ন, আর আলেম সম্প্রদায় উর্দ্দুর মারফতে প্রচার কার্য্য চালাইয়া পেটের অন্ন সংস্থানে ব্যস্ত। কাজেই মাতৃ-ভাষার চর্চ্চা হয় নাই বলিয়া আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। কেহ কেহ উর্দ্দুকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে চালাইতে চাহেন; কিন্তু তাহা অতি দুরূহ। মুখের কথায় কেহ কোন দেশবাসীর মাতৃভাষা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা ন্যূনাধিক গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু যে ভাষা তাঁহারা মাতৃ-স্তন্য পানের সহিত শ্রবণ করিয়া আসিয়াছে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহার সহিত অপর কোন ভাষার প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না। অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সমাজে উর্দ্দুর প্রচলন অতি আয়াস সাধ্য এবং পরদা-নিশীন মাতৃ-জাতির মধ্যে উহার প্রবর্ত্তন একরূপ অসম্ভব। সুতরাং বাংলাকেই বঙ্গীয় মুস্‌লিম সাহিত্যের বাহন করিয়া লইতে হইবে।

প্রচলিত বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কোন কোন মুসলমানের একটা অভিযোগ আছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, উহা বাংলার মুসলমানদের ভাষা নহে, উহা সংস্কৃতশব্দবহুল। এই হেতু কতিপয় মুসলমান বাংলা ভাষার মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্দের প্রচলন দ্বারা উহাকে মুসলমানদের হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টায় আছেন। এস্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, ভাষা সাহিত্যের বাহন মাত্র, উহাই সাহিত্য নহে। প্রকৃত সাহিত্যের পরিচয় উহার ভাবে এবং প্রকাশের ভঙ্গীতে। যে স্থলে এই দুইটী জিনিস বিদ্যমান আছে, তথায় ভাষায় সংস্কৃত বা আরবী ফারসী শব্দের ন্যূনাধিক্যে সাহিত্যের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সংস্কৃতশব্দ-বহুল হইলেও ভাষা উৎকট বিকট না হইতে পারে, আবার খাঁটী বাংলাও শ্রুতি-মধুর না হইতে পারে। তদ্রূপ আরবী ফারসী বেশী থাকিতেও হয়ত তাহা বাংলা ভাষার মধ্যে বে-মালুম খাপ খাইতে পারে; আবার তাহাদের পরিমাণ কম হইলেও হয়ত তাহা একদিকে সাধারণ পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী না হইতে পারে এবং অপরদিকে মুসলমানদের নিকটও তাহাদের মাতৃ-ভাষা বলিয়া গণ্য না হইতে পারে। মোট কথা, ভাষায় কি পরিমাণ সংস্কৃত বা আরবী ফারসী শব্দ থাকিবে তাহা কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না; তবে একথা ঠিক মুসলমানগণ সাহিত্যক্ষেত্রে মনোনিবেশ করিলে যে, বর্ত্তমান বাংলা ভাষার মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতশব্দবহুল বাংলা মুস্‌লিম সমাজে আদরণীয় হইবে না। আবার আরবী ফারসী বহুল পরিমাণে প্রচলন করিলে তাহাও সাধারণ বঙ্গবাসী গ্রহণ করিবে না। বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান বহুদিন যাবৎ একত্র বসবাস করিয়া আসিতেছে, ইহার ফলে সাধারণ মুস্‌লিম কথা বার্ত্তায় যে সকল বিদেশীয় শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা সাধারণ হিন্দুর উপলব্ধি করিতে আদৌ বেগ পাইতে হয় না। যদি বাংলা সাহিত্যের ভাষায় ঐ সমস্ত শব্দের প্রচলন হয় তবে তাহাই মুসলমানদের নিকট তাহাদের মাতৃ-ভাষা বলিয়া আদৃত হইবে।

কিন্তু প্রচলিত বাংলা ভাষার মধ্যে কতিপয় মুসলিম শব্দের প্রচলন হইলেই মুস্‌লিম

বাঙ্গলা সাহিত্যে মুস্‌লিম ভাব

সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে না। মুস্‌লিম সাহিত্যের বিশেষত্ব থাকিবে তাহার ভাবে, তাহার ভাষায় নহে। যতদিন মুসলমান তাহার সাহিত্যে মুস্‌লিম আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে না পারিবে, ততদিন প্রকৃত মুস্‌লিম সাহিত্য সৃষ্ট হইবে না। অধুনা যে সমস্ত মুসলমান সাহিত্যসেবার যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই হিন্দু আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের লেখায় এমন কোন বিশেষত্ব পাওয়া যায় না যাহা হইতে উহা মুসলমানের লেখনী-প্রসূত বলিয়া সহসা প্রতীয়মান হয়। মুসলমানের একটা নিজস্ব সম্পদ আছে। উহা প্রকাশ করাই মুস্‌লিম সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহার এক প্রধান ফল এই হইবে যে, অপর সম্প্রদায়ের লোক মুসলমানকে ভালরূপে চিনিতে সুযোগ পাইবে এবং তাহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। মুসলমান যদি অপর সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তা পাইতে আশা করে, তবে তাহাকে তাহার মধ্যে যাহা শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয় আছে তাহা তাহাদের সমক্ষে সঠিকভাবে উপস্থিত করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, সাহিত্যের ভিতর দিয়া মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মিলন আশা করা যায়, অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনেক মুসলমানের একটা বিতৃষ্ণা আছে। তাঁহারা বলেন, বাংলার বড় বড় সাহিত্যিকও মুসলমানকে নিকৃষ্টরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, মুসলমান হাতে কলম ধরিতে পারিলেই তাহার পক্ষে ইহার প্রতিশোধ লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কোন লেখক এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যাহা কিছুতেই সুরুচিসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। তাহাতে মুসলমান সমাজের গৌরব বাড়িতেছে না, বরং তাহাতে অন্য সমাজের নিকট আমাদের নিকৃষ্ট চিত্তের পরিচয়ই দেওয়া হইতেছে। ইহা বাস্তবিকই লজ্জার বিষয়। আমাদের এস্থলে পাল্‌টা হীন মনোবৃত্তির পরিচয় না দিয়া, উচ্চতর মনোবৃত্তি ও উদার সুরুচির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, আমাদের জীবনের মার্জ্জিত রূপটী ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মুসলমানকে যদি অপর সম্প্রদায়ের লোক ভাল ভাবে চিত্রিত না করিয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য তাঁহারা যেমন দায়ী, মুসলমানও সেইরূপ দায়ী। তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল মুসলমানকে সুন্দররূপে জানিবার চেষ্টা করা এবং মুসলমানের উচিত ছিল নিজকে তাঁহাদের নিকট সঠিক ভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাওয়া। গলাবাজি করিয়া কিংবা প্রতিহিংসা-মূলক ভাষা ব্যবহার করিয়া সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করা যায় না। সে গৌরবের সর্ব্ব প্রথম বিষয় হইতেছে আমাদের সুন্দর ও মার্জ্জিত জীবন। সেইরূপ জীবন-সম্পদ আমাদের নাই। সে জন্য অন্য সমাজের লোক আমাদিগকে ঘৃণা করেন এবং নিকৃষ্ট জীবরূপে চিত্রিত করেন। সেজন্য আমরা অত্যধিক অপরাধী। আমি নোংরা থাকিলে কে আমাকে সভ্যসুন্দর বলিতে পারে? যাঁহারা আমাদিগকে কুশ্রী করিয়া আঁকিয়াছেন—তাঁহাদের সামনে আমাদের জীবনের খুব ভাল

ছবি ছিল না। সুতরাং সেজন্য শিল্পীকে দোষ না দিয়া আমাদের সমাজের রূপকে দোষ দেওয়া উচিত। তাই বলি আজ আমাদের জীবনকে শ্রদ্ধের করিতে হইবে—সেজন্য আজ চিন্তাশীল সাহিত্যিকের আবির্ভাব হওয়া চাই। "সাহিত্য—সমাজ" সেই সাহিত্যিকের আগমন সহজ করিতে ব্রতী হউক—এই কামনা করি।

জাতি হিসাবে বঙ্গীয় মুস্‌লিম জগতের মধ্যে সভ্যতায় নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে। কে তাহাকে গালিমন্দ দিয়াছে, কিরূপে তাহার প্রতিশোধ লওয়া যাইবে এই আলোচনায় সময় ও শক্তি ক্ষেপণের অবসর তাহার আর নাই। তাহাকে একাগ্রমনে আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাতেই তাহার মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং তাহাতেই তাহার কলঙ্ক মোচন হইবে।

মুস্‌লিম সমাজে সাহিত্য চর্চ্চার অন্তরায়

সাহিত্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, জোর করিয়া বা ফরমাইশ দিয়া কেহ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে না। সাহিত্য ফুলের ন্যায় আপনি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু গাছের গোড়ায় জল সিঞ্চন করিয়া যেমন উহার পুষ্টির ও পরোক্ষভাবে ফুলোৎপত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, তদ্রূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারাও সাহিত্য সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করা যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক "মুসলিম সাহিত্য—সমাজ" এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটনে সাহায্য করিতে পারেন কি না। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ বর্ত্তমানে যেরূপ সংকীর্ণ জীবন যাপন করিতেছে, তাহাতে তাহাদের মধ্যে সাহিত্যের সৃষ্টি অসম্ভব। সংকীর্ণতা তাহাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়াছে। তাহাদের মানসিক পরিদৃষ্টি (outlook) অতি সংকীর্ণ, তাহাদের মধ্যে উদার শিক্ষা অতি বিরল। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার আভাস পাওয়া যায় না। যাঁহারা আলেম বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত পৃথিবীর কোন বিষয়ের সংবাদ রাখেন না। যাঁহাদের পার্থিব বিষয় সমূহের কিছু জ্ঞান আছে, ধর্ম্ম শিক্ষার সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই বলিলেও চলে। যাঁহারা আরবী জানেন, তাঁহারা ইংরেজী জানেন না এবং জানা আবশ্যকও মনে করেন না। যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা আরবী জানেন না এবং আরবীর মধ্যে জানার উপযোগী কিছু আছে বলিয়াও বিশ্বাস করেন না। জ্ঞানের কি ভীষণ দৈন্য আমাদের বাংলার মুস্‌লিম সমাজে। যখন মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল, তখন তাঁহারা নিজেদের মাতৃভাষা ত জানিতেনই, তাহা ছাড়া তখনকার দিনে যে সমস্ত ভাষায় সাহিত্যের প্রাচুর্য্য ছিল তৎসমুদয়ও নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করিয়া নূতন ভাবে তাহা আলোচনা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, যিনি গণিতজ্ঞ বা জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন, তিনিও সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন। মুসলমানগণ তখন দূরদেশে থাকিয়া যতটুকু সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন, আজ তাঁহারা বহু শতাব্দী হিন্দুদের সহিত একত্র বসবাস সত্ত্বেও তাহার শতাংশের একাংশ করিতেছেন না। ওমর খাইয়াম দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ হইয়াও সাহিত্য-সেবায়

অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আর আজ মুসলিম সমাজে এমন একাগ্র-চিত্ত সাহিত্য-সেবীও পাওয়া দুষ্কর, যিনি একজন সাধারণ সাহিত্যিক বলিয়াও পরিচিত হইতে পারেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রেও মুসলমানদের সংকীর্ণতা অতি শোচনীয়। তাঁহারা ধর্ম্মের নামে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন কিন্তু ধর্ম্ম কি, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সঠিক ধারণা নাই। তাঁহারা ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়া তর্কাতর্কি করেন কিন্তু উহার ভিতরকার আসল জিনিসটী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা অনুষ্ঠানকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন কিন্তু অনুষ্ঠান যে কোন বৃহত্তর ও মহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায় মাত্র, ইহা তাঁহাদের চিন্তা করিবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি নাই। তাঁহারা চক্ষু বুজিয়া শাস্ত্রের আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলেন বা চলেন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহাদের মূলে যে কোন যুক্তি থাকিতে পারে তাহা একবার ভাবিয়া দেখেন না এবং ভাবিয়া দেখাও নিষ্প্রয়োজন বা আত্মার অবনতির কারণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের আত্ম-বিশ্বাস নাই। তাই তাঁহারা আপন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করেন। জাতীয় জীবনে এত বড় জড়তার দৃষ্টান্ত বোধ হয় আজ আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি সহসা এমন কোন নব-আলোক (X rays) এর আবিষ্কার হয় যাহাতে এই নিবিড় জড়তা আলোকিত ও সমুদ্ভাসিত হইতে পারে, তবেই মুসলিম সমাজে সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইবে। এই আলোকের প্রবেশপথ পরিষ্কার করিতে "মুস্‌লিম সাহিত্য-সমাজ" নিশ্চয়ই সাহায্য করিতে পারেন। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে উদার শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে পারেন। যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারা ইংরেজীর যোগে নানা দেশের (culture) সভ্যতা ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে অবগত হইতে পারেন এবং তাহা ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ লোকের সম্মুখে ভাষান্তরিত করিয়া উপস্থিত করিতে পারেন। যাঁহারা আরবীতে অভিজ্ঞ তাঁহারা ইস্‌লামে যাহা কিছু সুন্দর ও মনোরম এবং আধুনিক সমস্যা সমাধানের অনুকূল তাহা তরজমা করিয়া যাঁহারা আরবী জানেন না তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত করিতে পারেন। উভয় দল পরস্পরকে জানিবার, বুঝিবার ও শ্রদ্ধা করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে পারেন। এই প্রকার ভাবের আদান প্রদানে হয়তঃ মুসলিম-সমাজে এক নূতন আলোক প্রকাশিত হইবে এবং তাহার ফলে সাহিত্য সৃষ্টির পথ সুগম হইবে।

সাহিত্য ও শিক্ষা

সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ যাঁহারা সাহিত্যের সেবা করিবেন, তাঁহাদের সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সুশিক্ষিত হইতে হইলেই যে বি-এ, এম-এ পাশ করিতে হইবে, এমন নহে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইয়াও সুশিক্ষিত হওয়া সম্ভবপর। সুশিক্ষার জন্য অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক এবং অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ হইতেই সাহিত্যের মাল মসলা সংগৃহীত হয়। অধ্যয়ন দ্বারা অতীত ও বর্ত্তমান মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত পরিচয় ঘটে, সাহিত্যের দোষ

গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে, চিন্তাশক্তি প্রখর হয় এবং রুচি মার্জ্জিত হয়। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মানস ও বাহ্য প্রকৃতির অনেক গূঢ় তত্ত্ব গোচরীভূত হয়। যাহা জন-সাধারণের নিকট নিতান্ত সামান্য ও অর্থবিহীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাও পর্য্যবেক্ষণশীল লোকের নিকট অনেক সময়ে অতি সারগর্ভ ও মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যাহারা সাহিত্য পাঠ করিবেন তাঁহাদের সাহিত্য বুঝিবার এবং উপভোগ করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। যতদিন মুসলিম সমাজে বিদ্যাশিক্ষার প্রসার না হয়, ততদিন তাহাদের মধ্যে সাহিত্যের আস্বাদ দানের চেষ্টা বৃথা। বাংলার সাধারণ মুসলিম বটতলার প্রকাশিত পুঁথি পড়িয়া পঠনের আমোদ উপভোগ করে। উহাই তাহার সাহিত্য। প্রকৃত সাহিত্য পাঠ করিবার বা উপভোগ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তাহাকে প্রকৃত সাহিত্যের রস আস্বাদ করান অসম্ভব। সুতরাং মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করা "মুসলিম সাহিত্য সমাজের" অন্যতম কর্ত্তব্য।

কি উপায়ে মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহাদিগকে শিক্ষার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করা যাইতে পারে, তদ্বিষয় বহু মনীষী ব্যক্তি বহু গবেষণা করিয়াছেন। এইরূপ এক গবেষণার ফলে দেশে জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা বাড়িতেছে। ইংরেজী বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিয়া মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন নাই। এই অভাব পূরণের জন্যই এই মাদ্রাসা-প্রণালীর উদ্ভাবন হয়। ইহার ফলে বহু মাদ্রাসার উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মানুষের কোন অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয় না। মাদ্রাসা প্রণালীরও দোষ আছে। মুসলিম সমাজের একদল ইহাকে দূষণীয় বলিয়া ইহার বর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন এবং অপর দল ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া ইহার দোষ স্বীকার করিবার সাহস পাইতেছেন না।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই নূতন প্রণালীর মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল মুসলমান পূর্ব্বে আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তাঁহারাও ইহার প্রতি কথঞ্চিৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত বিদ্যালয়েও যে ইসলামিক শিক্ষার সুচারু ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নহে। তথাপি ইহার প্রতি মুসলিমগণের আস্থা স্থাপিত হওয়ার কারণ এই যে, তাঁহারা যে মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বসাধারণ মানব হইতে পৃথক রাখিতে চান ইহাতে তাহার একটা পরিতুষ্টি হয়। তাঁহারা অতি ধর্ম্ম-প্রাণ, তাঁহারা ধর্ম্ম হীন শিক্ষার বিরোধী, এই কথাটাই তাঁহারা সব সময়ে সপ্রমাণ করিতে চান। ইংরেজী শিক্ষার ফলে লোক ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে, এই ভয়েই মুসলমানগণ উহা হইতে দূরে সরিয়াছিলেন এবং এই ভয় এখনো মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার অভাবের জন্য অনেকখানি দায়ী।

এই সংস্কার দূরীকরণের উপায়ান্তর না পাওয়ায় নূতন মাদ্রাসা প্রণালীর যোগে ফাঁকি দিয়া মুসলমানদিগকে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। এই চেষ্টা যে অনেকটা ফলবতী হইয়াছে তাহাও সত্য। অনেক স্থলে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়াতে এমন অনেক বালক তাহাতে যোগদান করিতেছে যাহারা অপর কোন বিদ্যালয়ে যাইত না এবং মাদ্রাসা না হইলে সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকিয়া যাইত। যে কারণেই হউক যখন মাদ্রাসা প্রণালী জন সাধারণ মুসলমানের নিকট অপরাপর বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে অধিকতর আদৃত হইয়াছে, তখন ইহাকে উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ইহারই যোগে মুসলমানের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা পাইতে হইবে। কোন পদ্ধতিকে দূষণীয় বলিয়া বর্জ্জন করা যত সহজ, তাহার স্থানে অপর একটী গড়িয়া তোলা তত সহজ নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে সমস্ত দোষ আছে, তাহার সংশোধন করা আবশ্যক। 'দীন ও দুনিয়ার' শিক্ষা একাধারে ও সমানভাবে দেওয়া হইবে এই উদ্দেশ্যেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই উদ্দেশ্য আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

আমার মনে হয়, এই প্রণালীর প্রধান দোষ এই যে, ইহার পাঠ্য তালিকা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সোপান-অনুযায়ী নহে। ইহার ফলে তাহার উপর অত্যধিক চাপ পড়িতেছে, অথচ সে উহা আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। পরীক্ষা পাশের জন্যে সে কোন প্রকারে কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়া যাইতেছে কিন্তু উহার মর্ম্ম তাহার চিত্ত বিকাশের পক্ষে সহায় হইতেছে না বলিয়া তাহার প্রকৃত শিক্ষালাভ হইতেছে না। জুনিয়ার মাদ্রাসায় সুকুমারমতি বালককে মধ্য-ইংরাজী স্কুলের যাবতীয় পাঠ্য পড়িতে হইতেছে; তাহার উপর আবার আরবী, উর্দ্দু ও দীনিয়াতের ভার চাপান হইয়াছে। হাই মাদ্রাসার অবস্থাও তদ্রূপ। তথায় শিক্ষার্থীকে হাই স্কুলের ইংরাজী, বাংলা ইত্যাদির সহিত হাদীস, তফসির, কোরাণ, কালাম, ফেকা, ওসুল মনতক ইত্যাদি বিষয় পড়ান হইতেছে। অথচ ইহাদের কোন একটী বুঝিবার মত বুদ্ধির পরিপক্কতা-সুলভ শক্তি তাহার হয় নাই। ইহার ফল এই হইতেছে যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি বৃত্তির উন্মেষ না হওয়ায় সে একটী জীবন্ত-যন্ত্রে পরিণত হইতেছে। উপরোক্ত দোষের ফলে ইহার দ্বিতীয় দোষ এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাতে উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হইতেছে না। যতটুকু গণিত, ভূগোল ও ইতিহাসের জ্ঞান উচ্চ শিক্ষার সোপানে সোপানে আবশ্যক হয় এবং যাহা না হইলে লোক অশিক্ষিত থাকিয়া যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহাতে তাহার অভাব রহিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দোষের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ ইহার তৃতীয় দোষ এই হইয়াছে যে, ইহা জীবন সংগ্রামের সমস্যা সমাধান করিবার মত বুদ্ধি ও শক্তি পরিপুষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নহে। ইহা দ্বারা শিক্ষার্থী সাংসারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত সমকক্ষতা করিয়া জীবিকা-অর্জ্জনে সক্ষম নহে। যে শিক্ষা জীবিকা অর্জ্জনের সম্যক্ সহায়তা করে না

তাহা দুইদিন পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা এরূপ নহে যে, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত ইহার ফলাফল দেখিবার জন্ম অপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট শিক্ষাক্ষেত্রে আজ প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত মূল্যবান। সুতরাং এখন হইতেই ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করা আবশ্যক। এস্থলে আশার বিষয় এই যে, ইহাতে ইতি পূর্ব্বেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের বা জন সাধারণের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই।

শিক্ষা ও ধর্ম্ম

শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের সংযোগ আবশ্যক। কিন্তু এই সংযোগ প্রকৃত শিক্ষার প্রতিকূল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ধর্ম্মের নামে এই মাদ্রাসাগুলিতে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দুর্ব্বোধ্য আরবী ভাষার শব্দগুলি কণ্ঠস্থ করিতে শক্তি ও সময় অযথা ব্যয়িত হয়। তৎসমুদয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে অধিকতর সুফল ফলিতে পারে। ইহাতে বিষয়গুলি সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, অথচ শিক্ষার্থী পার্থিব বিষয়গুলিতে অধিকতর মনোনিবেশ করিবার সুযোগ পাইতে পারে। কিন্তু আমাদের একটী মোহ আছে, আমরা হাই মাদ্রাসায় বড় বড় আলেমের লিখিত বড় বড় কেতাব পড়াইয়া গৌরব অনুভব করি। সেই মোহকে জয় করিবার জন্ম আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে।

একথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি এই বিষয়গুলির বা যে সমস্ত পুস্তক হইতে এই বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়, সেগুলির সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি। প্রত্যেক বিষয় শিক্ষার উপযোগী এক একটী সোপান আছে। যে সোপানে ঐগুলির শিক্ষা দেওয়া হয়, ঐগুলি সেই সোপানের উপযোগ্য নহে। কলেজিয়েট ও ইউনিভার্সিটি সোপানে উহাদের শিক্ষাদান সমধিক সমীচীন হইতে পারে। উহাদের ভাষা ও যুক্তি বুঝিবার জন্ম যে আরবীর জ্ঞান আবশ্যক, তাহার জন্ম জুনিয়র ও হাই মাদ্রাসায় ব্যবস্থা করা উচিত। আমার মতে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে আরবী ভাষার জ্ঞানের ভিত্তি ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মের সাধারণ বিধানগুলির ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং বিষয়গুলির নির্ব্বাচন এরূপ হয় যেন তাহা সাধারণ উচ্চ শিক্ষার পরিপন্থী না হয়। হাই মাদ্রাসা সোপানে সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্রগণ উপরের সোপান সমূহে নিজ নিজ যোগ্যতা ও অভিরুচি অনুসারে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবে। তাহা হইলে তাহারা পাঠে আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে এবং জীবন সংগ্রামেও কাহারও পশ্চাৎপদ হইবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা

বর্ত্তমান সময়ে দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। মুসলিম সমাজে শিক্ষা-বিস্তারের ইহা একটী সুবর্ণ সুযোগ। মুসলমানগণ প্রধানতঃ গ্রামে বাস করে।

তাহাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই গ্রাম্য পাঠশালায় বা মক্তবে বিদ্যারম্ভ করিয়াছেন। দূর ভবিষ্যতেও মুসলমানগণ গ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত থাকিবে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। যাহাতে এই শিক্ষা গ্রামবাসী সকলে সহজে ও বিনা ব্যয়ে পাইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক মুসলমানের ঐকান্তিক চেষ্টা করা আবশ্যক। একথা সত্য যে, অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে এবং উহার ব্যয়ভার বহনের অপর কোন ব্যবস্থা না হইলে গ্রাম্য মুসলমানদিগকে অতিরিক্ত কর দিতে হইবে। কিন্তু টাকা না হইলে এরূপ বিরাট ব্যাপার কিরূপে সম্ভবপর হইবে? মুসলমানকে এখনো অনেক কর দিতে হয় কিন্তু এই শিক্ষাকরের মধ্যে তাহার প্রকৃত মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। ইহাকে তাহার কিছুতেই ভয় করা উচিত হইবে না। খোদাতা'লার নাম স্মরণ করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া ইহার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি কোন কারণ বশতঃ এই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার আইন আইন-সভায় পাশ না হয়, তাহা হইলেও শিক্ষার বন্দোবস্ত তাহাকে করিতে হইবে এবং তাহাতে তাহাকে অধিকতর ক্লেশ ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যা এবং তাহাদের কৃতিত্ব দেখিলেই কেহই মনে করিতে পারে না যে, এদেশের মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে এত পশ্চাৎপদ। গত প্রাইমারী পরীক্ষার ফল কলিকাতা গেজেটে ছাপা হইয়াছে। তাহাতে মুসলিম বালক বালিকাগণ বহুল পরিমাণে বৃত্তি লাভ করিয়াছে এবং গুণানুসারেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গৌরবজনক উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। যদি প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়, তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা মেধাবী ব'লয়া পরিগণিত হয় তাহাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হইবে। সুতরাং মুসলিম মাত্রেরই ইহাতে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। মুসলিম সাহিত্যিকগণেরও এবিষয়ে যথেষ্ট করণীয় আছে। তাঁহারা এ বিষয় সর্ব্বসাধারণকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের লেখনী চালনা করিতে পারেন।

স্ত্রী-শিক্ষা

মুসলিম শিক্ষা-প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার একান্ত অভাব। যতদিন এই অভাব পূর্ণ না হইবে ততদিন তাহারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য সকলক্ষেত্রে অপরাপর সম্প্রদায়ের পিছনে পড়িয়া থাকিবে। মাতৃজাতি জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন। মাতৃক্রোড়ে শিশুর জীবনের লক্ষ্য নিরূপিত হয়, তাহার উচ্চাকাঙ্খা অঙ্কুরিত হয়। মাতার সম্মুখে জাতীয় জীবনের যে আদর্শ স্থাপিত হয় শিশু ঠিক সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। জাতীয় জীবনের আদর্শ যদি মাতৃগণ আপন প্রাণে অনুভব করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা কখন উহা তাঁহাদের সন্তানগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে পারেন না। এই হেতু যে জাতির মাতৃগণের মধ্যে শিক্ষার যত

অভাব সে জাতির উন্নতির পথ তত দুর্গম। মুসলমানগণ যদি সমাজ হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদিগকে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ দিতে হইবে।

এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্ত্রী-শিক্ষা ইসলাম ধর্ম্মের অবশ্য পালনীয় বিধান হওয়া সত্বেও মুসলমানগণ তাহার প্রতি মারাত্মকরূপে উদাসীন; অথচ তাহাদের অনেক প্রতিবেশীর মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে বহুকালের কুসংস্কার প্রচলিত থাকাতেও তাঁহারা ইহার প্রতি বেশী মনোযোগী। মুসলমানদের এ উদাসীনতা আত্ম-ঘাতী। ইহা তাহাদের সর্ব্ব-প্রকার উন্নতির পরিপন্থী। যত দিন তাহারা ইহা ঝাড়িয়া না ফেলিবে তত দিন তাহাদের পদে পদে বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। কিছুদিন হইল বঙ্গের ডিরেক্টর বাহাদুর মাননীয় ওটেন সাহেব ইডেন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় বলিয়াছিলেন, "মুসলমানগণ এক সময়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া তাহার জন্ত আজ অনুশোচনা করিতেছেন। আজ যখন দেশে স্ত্রী-শিক্ষার সাড়া পড়িয়াছে তখন তাহাতে উদাসীনতা দেখাইলে তাঁহারা পুনরায় ঠকিবেন এবং একদিন তাহার জন্ত তাঁহাদিগকে অনুতাপ করিতেই হইবে।" কথাটা ঠিক। এ বিষয় আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। মানুষ একবার ঠকিলে সাবধান হয়, আর আমরা কি চিরকালই ঠকিতে থাকিব?

অনেক মুসলমান মনে করেন, বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষা-দান পদ্ধতি তাঁহাদের বালিকাগণের উপযোগী নহে এবং সেই জন্ত তাঁহারা তাহাদের গৃহ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষা অননুমোদিত হইলে গৃহ শিক্ষার ব্যবস্থায় কিছুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না। এমন অনেক কৃতবিদ্য লোক আছেন যাঁহারা আমাদের দেশের বালক বিদ্যালয়গুলিকেও শিক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং তজ্জন্ত আপন পুত্রগণের শিক্ষার জন্ত গৃহে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মুসলমানদের এই কল্পিত গৃহশিক্ষাটা যে আদৌ শিক্ষা নহে, একথা তাহাদের অনেকে অন্তরে অনুভব করিলেও মুখে স্বীকার করিতেছেন না।

এদেশের প্রচলিত স্ত্রী-শিক্ষার সংস্কার হওয়া আবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া যতদিন ইহার সংস্কার না হয় ততদিন ইহার বর্জ্জন করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার সংস্রবে আসিলেই কেবল মাত্র ইহার দোষ গুণ ভালরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিলে ইহার গুণেরও পরিচয় হইবে না এবং ইহার দোষেরও সংশোধনের চেষ্টা হইবে না। সাঁতার দিয়াই লোকে সাঁতার শিখিতে পারে। শিশু হাঁটিয়াই হাঁটিতে শিখে। একথা আর কতকাল আমরা না বুঝিয়া থাকিব?

আর একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া

সাহিত্য সমাজে ধর্ম্ম চর্চ্চা

যায়, সাহিত্য সমাজে ধর্ম্ম-চর্চ্চা হয় কেন? সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্নটী প্রায়ই উত্থিত হয় বলিয়া এস্থলে উহার পুনরুক্তি করা আবশ্যক মনে করি। জীবনের সহিত যাহা ঘনিষ্ঠরূপে সংস্পৃষ্ট

তাহাই সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়। মানুষের ভাব-বৃত্তি-সমূহের প্রকাশ, তাহার কার্য্য প্রণালীর সমালোচনা, সমাজের দোষ সমূহের উদ্ঘাটন, সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য। জাতীয় জীবনে যখন যে আদর্শ থাকে তাহাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, সাহিত্যিক তাঁহার অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম-দর্শিতা বলে যাহা সমাজের পক্ষে শ্রেয় ও অনুকরণীয় মনে করেন তাহারই আদর্শ সর্ব্ব-সমক্ষে উপস্থিত করেন। সাহিত্যের সৃষ্টিতে যে সমস্ত উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তন্মধ্যে সমাজ সংস্কার অন্যতম। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যিক তাঁহার চক্ষে যাহা নিন্দনীয় পরিত্যাজ্য প্রতীয়মান হয় তাহা এরূপ ভাবে সর্ব্ব-সমক্ষে উপস্থিত করেন যেন তৎপ্রতি সকলেরই স্বতঃপ্রণোদিত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয় এবং যাহা প্রশংসার্হ ও কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা এরূপ ভাবে অবতারণা করেন যেন সর্ব্ব-সাধারণের মন তাহার প্রতি অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট হয়। মুসলমানের ধর্ম্ম তাহার সমগ্র জীবনব্যাপী একটী সমস্যা। তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সম্বন্ধ এরূপ ভাবে জড়িত যে তাহাদের বিচ্ছেদ কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং কোন মুসলমান সাহিত্যিক সমাজ সংস্কার উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হইলে তাঁহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার সহিত কাহারো মতের অনৈক্য হইলে তজ্জন্য অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নহে। শান্তভাবে তাঁহার প্রতিবাদ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতের মধ্যে যাহা অনভিপ্রেত, যুক্তি সহকারে তাহার খণ্ডন করা যাইতে পারে। ইহাতে এক দিকে যেমন সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, অপর দিকে তেমনি অপরের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতার ন্যায় শত্রু আর নাই। যখন যিনি যে বিষয়ে আলোচনা করিবেন, সে বিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য আছে তাঁহার তাহা যথা সম্ভব জানিয়া শুনিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তাহা হইলে আলোচনা প্রকৃত পক্ষে সুফলপ্রদ হইবে এবং তাহাতে কোন পক্ষ হইতে বিশেষ কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না।

উপসংহার

এইক্ষণ আমি উপসংহার করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য-পরীক্ষা শেষ করিব। যাহা আমি বলিয়াছি তাহা খুব গভীর জ্ঞান বা গবেষণার কথা নয়। আজ আমাদের সমাজের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রন্দন করিতেছে তাহারই প্রতি আপনাদের শুভ দৃষ্টি ও বিস্তৃত জ্ঞান আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। সকলেই এসমস্ত বিষয় অবগত আছেন—কিন্তু আমাদিগকে এমন একটা নিসাড় ভাবও ভীরুতা ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা একেবারে সাড়া-শব্দ করিতে চাহিতেছি না। "মুস্‌লিম সাহিত্য-সমাজের" চেষ্টা এই নিসাড়তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে সক্ষম হউক—এই কামনা করি।

আজ আমার সকল প্রার্থনার মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রার্থনা এই—"হে খোদাতলা! মুস্‌লিম সাহিত্যিকের লেখনী শক্তিশালী হউক—তাহার চিত্ত উন্মুক্ত সম্প্রসারিত হউক—তাহার বুদ্ধি বিকশিত হউক—তাহার রুচি মার্জ্জিত হউক—মুস্‌লিম অমুস্‌লিম তাহার অন্তরে সমান শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠুক।"

৩—

দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্য বিবরণী

আজ আমাদের এই "সাহিত্য-সমাজের" বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইল। গত বৎসরের বার্ষিক সম্মেলনে ইহার জন্ম বৃত্তান্ত ও উদ্দেশ্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে—সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জীবনের অনুভূতি ও চিন্তা প্রকাশ করিয়া জন-সাধারণের নিসাড় জীবনে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তবেই সমাজ বাঁচিবে; নতুবা তাহাদের প্রাণ-ধারা রসহীন মরুভূমির ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

এ বৎসর নানা কারণে আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আর একটু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য প্রথমে এ বৎসরকার পঠিত প্রবন্ধ গুলিতে আমরা কি বলিতে চাহিয়াছি তাহাই বিবৃত করিতেছি।

প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলবী আবুল হুসেন এম-এ, বি-এল সাহেব। বিষয় "আদেশের নিগ্রহ"। তিনি বলেন, ঈশ্বর এবং পরলোকে বিশ্বাস, ইহাই প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। কিন্তু এই বিশ্বাস শুধু মুখে মুখে থাকিলে চলিবেনা—অন্তরের বিশ্বাসই প্রকৃত জিনিষ। ধর্ম্ম-প্রচারকগণ যে অনুশাসন দেন, তাহার উদ্দেশ্য মানব-সমাজের উন্নতি। বস্তুতঃ মানব-জাতির হিতই ধর্ম্মের লক্ষ্য। ধর্ম্মের সহিত মানব প্রকৃতির মূলতঃ কোন বিরোধ থাকিলে, সে ধর্ম্মকে লোকে চিরকাল শ্রদ্ধা করিতে পারে না। এ জন্য যুগে যুগে পৃথিবীর নব নব প্রয়োজন বা সমস্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মেরই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মুসলমানেরা ইসলামকে যে-ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে, তাহাতে যথেষ্ট অন্ধ-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, দলে দলে লোক ভিক্ষা ও ঋণ করিয়া হজ্ব করিতে যায়—স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের দিকে লক্ষ্য করে না। লোকে হুজুর মসলা আওড়াইতে পঞ্চমুখ, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি নাই। লোকে জমায়াত করিয়া নামাজ পড়িতেছে, কিন্তু একতার দিকে লক্ষ্য নাই। এইরূপ, লোকে জুমার নামাজ পড়িতেছে, খোৎবা শুনিতেছে, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইতেছে কারণ তাহারা ইহার অর্থও বোঝে না, উদ্দেশ্যও জানে না। এই জন্যই দেখা যায়, বহু মুসলমান, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিখুঁৎভাবে পালন করিতেছে, কিন্তু কই, তাহারা ত সুরুচি, কর্ম্ম বা জ্ঞান, কোন ক্ষেত্রেই উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে তাহারা কেবল ভিক্ষুক ও ব্যভিচারীর দলই পুষ্ট করিতেছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে তাহাদের ঈশ্বরে বা পরলোকে প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস নাই। কিন্তু এখন অন্ধের মত বা নির্ব্বোধের মত শাস্ত্র আওড়াইলে বা শুধু অনুষ্ঠান পালন করিলে আর

মুসলমানের মুক্তি নাই। মুসলমানকে বুঝিতে হইবে যে, কোরাণ হাদিস তাকে তুলিয়া রাখিবার জন্য নয়—জীবনে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত। আজ সমগ্র জগতে মুসলমানের একই নিরবচ্ছিন্ন কদর্য্য ছবি। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? মুসলমানকে বুঝিতে হইবে যে ইসলামের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জন্য,—কেবল বিধি নিষেধগুলির পূজা করিবার জন্যই মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। যদি দেখা যায় যে ইসলামের কোন বিধি মানব-সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে নূতন বিধি গড়িতে হইবে, পুরাতনের মোহে হাবুডুবু খাইলে আর পরিত্রাণ নাই। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন, সুদের ফৎওয়া এই সমস্ত বর্ত্তমান জগতের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে গুলির পরিবর্ত্তন বা সংস্কার আবশ্যক। মহাপুরুষগণকে শ্রেণীবদ্ধ আলোক-স্তম্ভের সহিত তুলনা করা যায়। একটি আলো ম্লান হইয়া থাকিলে, সেই শিখাতে অন্য আলো জ্বালান উচিত, এবং তাহাকে পূর্ব্বতন আলোকেরই পরিণতি বা বিবর্ত্তন বলা চলে। মূলনীতি ঠিক রাখিয়া শাস্ত্র-বিধির প্রয়োজন মত একটু আধটু সংস্কার করিয়া লইলে, তাহাও হজরত মহম্মদের ধর্ম্মই থাকিবে। সুতরাং পরিবর্ত্তনের নাম মাত্রেই আঁৎকাইয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত যে ধর্ম্ম, যাহা খোদার অভিপ্রেত—তাহা পালন করিলে আমাদের পার্থিব জীবনেই তজ্জনিত সুফল ও শান্তি ভোগ করিতে পাওয়া যাইবে—পরকালের জন্য আর দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন, কাজী মোতাহার হোসেন এম-এ সাহেব—বিষয় "আনন্দ ও মুসলমান গৃহ।" লেখক বলেন, আনন্দ ও হাসি জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ। হৃদয়ের প্রাচুর্য্য হইতেই তাহার জন্ম ও তাহা হইতেই পৃথিবীতে নব নব সৃষ্টির উদ্ভব হয়। যে সমাজ প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতে পারে, তাহার মধ্যে সঙ্কোচ দ্বিধা ও ভীরুতার বন্ধন নাই। সে সমাজ বলবান, স্বাধীন ও প্রাণময়, এজন্য তাহাই প্রতিভার জন্মদাতা। কিন্তু মুসলমান সমাজ নির্জীব ও আনন্দহীন। উন্নত চিন্তা ও আনন্দের তৃপ্তিতে চেহারায় যে লাবণ্য ও কমনীয়তা পরিস্ফুট হয়, তাহাও ইহাদের নাই। ইহার প্রধানতম কারণ—শিক্ষার অভাব, শিক্ষা না হইলে সুরুচি জন্মে না, এবং সুরুচি অভাবে হৃদয় ও মনের উন্নত বৃত্তিগুলি বিকশিত ও চরিতার্থ হইতে পারে না। উন্নতরুচির আনন্দের যেখানে অভাব, সেখানে সহজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূল আনন্দই চরম লক্ষ্য হয়। এজন্য দেখা যায়, কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাশবিক আনন্দ লইয়াই প্রায় পৌনে ষোল আনা মুসলমান মশ্‌গুল হইয়া আছে। অধিকাংশ মুসলমান-পরিবারেই বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর শিক্ষার অত্যন্ত অসমতা থাকায়, তাহাদের ভাব ও চিন্তা ধারায়ও দুর্লঙ্ঘ্য পার্থক্য। প্রধানতঃ এই কারণে এবং কতকটা পর্দ্দা প্রথার শুচি-বায়ুর জন্য গৃহ বলিতে যাহা বুঝায়, মুসলমানের তাহা নাই। এখানে ভাই বোন, পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, মাতা কন্যা সকলে মিলিয়া চিন্তার ক্ষেত্রে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে বা জীবন সমস্যার আলোচনায় এক

হইতে পারিতেছে না। এমন ইহাদের জীবন-আনন্দ-বিহীন, ছায়াবাজীর ন্যায় নড়াচড়া করিতেছে বটে, কিন্তু আসলে তাহা প্রাণহীন। তাহার উপর মুসলমান সমাজ মনোরঞ্জন-ক্ষম ললিত কলার চর্চাকে বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির চক্ষে দেখে না বলিয়া, তাহাদের মধ্যে আনন্দের উপকরণেরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান গান গাহিবে না, ছবি আঁকিবেনা, পিতার সামনে হাসিবে না, বড় ভাইএর সামনে খেলিবে না, গুরুজনের অন্যায় কথারও প্রতিবাদ করিবে না, এমন কি কচি মেয়েরা পর্য্যন্ত মার খাইলেও চেঁচাইয়া কাঁদিবে না, এইরূপ হাজার হাজার আদব কায়দা ও আইন কানুনের চাপে মুসলমানের আনন্দধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের একমাত্র ভরসা, মৃত্যুর পর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিয়া সুমিষ্ট মেওয়া ভক্ষণ করিবে, প্রাণ ভরিয়া শারাবান-তহুরা পান করিবে, আর চির-যৌবনা হুর পরীদের লইয়া অনন্তকাল ধরিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে পাইবে।—পরিশেষে তিনি বলেন, আমাদের সুরুচি সম্পন্ন আনন্দের সন্ধান ও সম্ভোগ করিবার মত ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তাহাতে যদি আমাদের সমাজ-গৃহের কিছু সংস্কার করা আবশ্যক হয়, তবে অকুণ্ঠিত ভাবে তাহাও করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলবী আবদুর রশীদ বি-এ, বি-টি সাহেব। বিষয় "মুক্তির আগ্রহ বনাম আদেশের নিগ্রহ।" তিনি বলেন, মুক্তির আগ্রহ মানুষের চিরকাল থেকেই আছে এবং চিরকালই থাকিবে। কিন্তু মানুষ যখন বস্তু বা ব্যক্তি নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না, তখন স্বাধীনতাও সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য, এজন্য আইনের প্রয়োজন। কিন্তু শাসনের কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা,—যেমন শরিয়ত—যদিও সাধারণ ভাবে সকলের উপরেই প্রযোজ্য, তবুও ইহাতে যে সকলের আত্মারই পরিতৃপ্তি হইবে, তাহা আশা করা অন্যায়। জগতে অভিজ্ঞতা জ্ঞানানুসন্ধিৎসা এবং বিচার-বুদ্ধিরও বিশেষ প্রয়োজন এবং মূল্য আছে। চিন্তাশীল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে শরিয়ত বা নিয়মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেও তাঁহাদের দ্বারা জগতের বিশেষ অকল্যাণ হইবার আশঙ্কা নাই; কারণ তাঁহারা স্ব স্ব জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে জীবন-ধারাকে যে ভাবে পরিচালিত করিবেন, তাহা মোটামুটি ভাবে শরিয়তের আদর্শের অনুযায়ীই হইবে, পরিপন্থী হইবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। কিন্তু সাধারণ লোক, যাহারা চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রসর নহে, তাহাদিগকে নিয়মের শৃঙ্খলে না বাঁধিলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে এবং সমাজে নানা প্রকার অশান্তি ও বিঘ্ন আনয়ন করে। এই হিসাবে আদেশের—বিশেষতঃ শরিয়তের আদেশের—যা' বিশ্বের কল্যাণকামী জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদিগের অবদান, তাহার সার্থকতা আছে। কিন্তু আদেশের একটা দিক, মানুষ সহজেই ভুলিয়া যায়। তাহারা ভুলিয়া যায় যে আদেশের সার্থকতা ঐখানে—যেখানে তাহা সত্যে পৌঁছিবার পথ নির্দ্দেশ করে। মানুষের প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষ শীঘ্রই আদেশের দাস হইয়া পড়ে। সময়ের পরিবর্ত্তনে যে "সত্য" বিবিধরূপ লইয়া প্রকাশিত হইতে পারে, সে কথা সাধারণ মানুষে চিন্তা করে না—যাহারা করে তাহাদিগকেও ইহারা বাধা দেয়, এই ভয়ে যে পাছে তাহাদের শাস্ত্রের

ইজ্জত নষ্ট হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, লেখক বলেন, বর্ত্তমান জগতের ব্যবসায়-নীতিতে সুদের আদান প্রদান অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তবু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, আমাদের সমাজে সুদের প্রচলন হইতেছে না। চিত্রকলা মনে সরসতা ও সজীবতা আনয়ন করে (বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে যে লোকে চিত্রকে খোদার আসনে বসাইবে, ইহাও ধারণা করা যায় না) তথাপি শাস্ত্র-বিদেরা এখনও চিত্রাঙ্কনকে হারাম বলিয়া ফৎওয়া দিতেছেন। সত্য বটে সঙ্গীত সময় সময় কর্ত্তব্য-বিস্মৃতি জন্মায়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার ক্লান্তি-নিবারণী ও চিত্তহারিণী শক্তিটাই বা মানিব না কেন? অথচ সমাজে দেখিতে পাই পবিত্র এমন কি ধর্ম্মভাবাপন্ন সঙ্গীতও দূষনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই প্রকার গোঁড়ামির ফলে আমাদের জ্ঞান-চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইতেছে; এবং শুষ্ক আদর্শের অর্থহীন অনুবর্ত্তিতার ফলে, আত্ম-প্রবঞ্চনা এবং পর প্রবঞ্চনা অর্থাৎ ভণ্ডামির মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিশেষে তিনি বলেন, আমাদিগকে সবল ও জ্ঞানপুষ্ট হইতে হইবে। তাহা হইলে দেখিতে পাইব, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিতেছে না—বিরোধ বাধিতেছে দুই চারিটা সংস্কারের সঙ্গে। কিন্তু তাহা আমাদিগকে অতিক্রম করিতেই হইবে।

চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তরুণ কবি আবদুল কাদের সাহেব। বিষয়—"পল্লী-সঙ্গীতে লীলাবাদ।" তিনি নিজের সংগৃহীত অনেক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের পদ আবৃত্তি করিয়া সকলের আনন্দ উৎপাদন করেন। ঘাটু-গান, বয়ের-গান, মুর্শিদ্যা-গান, মারফতী-গান, কবি-গান, কীর্ত্তন-গান প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বলেন—উহার অনেকগুলি গ্রাম্য চাষীদের জীবন-রস হইতে উৎপন্ন সরস সাহিত্য। প্রথম প্রথম চাষীদের জীবনে এই সমস্ত গানের ভিতর দিয়া ইসলাম এক বিশিষ্টরূপ লইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে কঠোর শরিয়ত-বাদী মৌলানা এবং পীরসাহেবদের কার্য্যতৎপরতায় চাষীদের জীবন-রস যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে তাহারা ধর্ম্মের যে সহজ সরল আস্বাদ পাইত, এখন আর তাহাদের সে অনুভূতি জাগ্রত নাই।

পঞ্চম প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলভী আবুল হুসেন এম-এ, বি-এল সাহেব। বিষয়—"বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ।" তিনি বলেন, বর্ত্তমানে মুসলমান সব দিকে পশ্চাৎপদ। সে দরিদ্র, মূর্খ এবং কৃপার পাত্র; অথচ বেশ আত্ম-পরিতুষ্ট এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। সমাজের নেতৃবর্গ শুধু গবর্ণমেণ্টের শতকরা হিসাব লইয়া তর্ক বিতর্কে ব্যস্ত—কিন্তু তাহাতে জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হইতেছে না। মুসলমান-সমাজ ক্রমেই দুর্ব্বল ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে অথচ এই ভিক্ষার দাবী করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করিতেছে না। আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র গুলিতে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং সেকেলে ধরণের শিক্ষা দিয়াই কোনরূপ জোড়াতালি দিয়া কাজ সারার ব্যবস্থা হইতেছে। সমস্ত সমাজ অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং তাহাকে অবনতি ভিন্ন উন্নতি বলা যায় না। আর

মোল্লার দল পীর সাজিয়া, নিরক্ষর ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সমাজের মাথায় হাত বুলাইয়া, তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার রাজপথ বাতলাইয়া দিয়া বেশ দু পয়সা উপায় করিয়া লইতেছে। এই পীরের দল বাস্তবিক পক্ষে কুসীদ-জীবি মহাজনের চেয়েও অধিক অত্যাচারী ও পাপী। কারণ তাহারা ধর্ম্মের ঘরে সিঁদেল চোর—তাহারা সমাজকে চির-দুর্ব্বল ও চির-অজ্ঞ করিয়া রাখিতেছে, এবং "দুনিয়া ফানী হায়" বলিয়া সমাজের সমস্ত কর্ম্মশক্তি ও উদ্যম উৎসাহের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। বিজ্ঞান-সম্মত স্বাস্থ্য-নীতিতে তাহাদের আস্থা নাই। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে; কিন্তু বেচারা গ্রামবাসীরা মোল্লা মৌলবী বা পীরের কুহকে পড়িয়া সিন্নি ও তাবিজ দিয়া ব্যাধি দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। মুসলমান-সমাজ আজ "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা নিজেদের কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারিতেছে না। নেতৃগণ সমাজের জন্য থোড়াই কেয়ার করেন, তাঁহাদের স্ব স্ব স্বার্থ সিদ্ধি হইলেই যথেষ্ট হইল। এই সমস্ত অবস্থা দূর করিতে না পারিলে মুসলমানের ভবিষ্যৎ অতি অন্ধকারময়। অতএব এখন নবীন কর্ম্মীদের নিঃস্বার্থভাবে পূর্ণ-উদ্যমে কাজ আরম্ভ করবার সময় আসিয়াছে।............

উল্লিখিত প্রবন্ধ গুলি লইয়া অবশ্য কিছু কিছু আলোচনা ও সমালোচনা হইয়াছিল। কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তথাপি আশা করা যায় যে প্রবন্ধ গুলি হইতেই লেখকগণের—তথা এই সাহিত্য-সমাজের—মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা চক্ষু বুঁজিয়া পরের কথা শুনিতে চাই না, বা শুনিয়াই মানিয়া লইতে চাই না;—আমরা চাই, চোখ মেলিয়া দেখিতে, সত্যকে জীবনে প্রকৃত ভাবে অনুভব করিতে। আমরা কল্পনা ও ভক্তির মোহ-আবরণে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চাই না। আমরা চাই জ্ঞান-শিখা দ্বারা অসার সংস্কারকে ভস্মীভূত করিতে এবং সনাতন সত্যকে কুহেলিকা-মুক্ত করিয়া ভাস্বর ও দীপ্তিমান করিতে। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না—আমরা চাই বর্ত্তমান মুসলমান-সমাজের বদ্ধ-কুসংস্কার এবং বহুকাল সঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর করিতে। আমরা অতীতের মোহে ডুবিয়া থাকিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে চাই না—আমরা চাই কর্ম্ম-স্রোতে ঝাঁপ দিয়া ইসলামের ভবিষ্যতকে মহিমা মণ্ডিত করিতে। আমরা জীবনকে "ভোজের বাজি" মনে করিয়া ঐহিক উন্নতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে চাই না—আমরা চাই জগতের সমুন্নত জাতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া জ্ঞানবান, বলবান ও ঐশ্বর্য্যবান হইয়া জীবনের পরিধি বর্দ্ধিত করিতে এবং তাহাকে পূর্ণভাবে আস্বাদ ও ভোগ করিতে। আমরা সমাজের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহার মাতব্বর সাজিয়া ছড়ি ঘুরাইতে চাই না। আমরা চাই সমাজের চিন্তা-ধারাকে কুটিল ও পঙ্কিল পথ হইতে ফিরাইয়া, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সহজ সত্য পথে চালিত করিয়া আমাদের দায়িত্ব-বোধের পরিচয় দিতে।

এক কথায় আমরা বুদ্ধিকে মুক্ত রাখিয়া প্রশান্ত জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা বস্তু—জগত এবং ভাব-জগতের ব্যাপারাদি প্রত্যক্ষ করিতে ও করাইতে চাই।

আমরা এ পর্য্যন্ত কতদূর সফলতা-লাভ করিয়াছি তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। কারণ, মাত্র দুই বৎসর কালের সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা যুগ যুগ সঞ্চিত ধারণা ও সংস্কারের কোন বড় রকম পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব না হইলেও, সেটা যে দুঃসাধ্য সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে আশার কথা, যুগ-ধর্ম্ম আমাদের সহায়। যাঁহারা একটু স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারাই প্রাণে এক অভিনব স্পন্দন অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয় তন্ত্রীতে এই স্পন্দন জাগাইয়া তোলাই আমাদের প্রথম কাজ। মনে হয়, এ কাজে আমরা অনেকখানি কৃতকার্য্য হইয়াছি। ক্রমে আমরা অসহিষ্ণুতা ও একদেশ-দর্শিতা ত্যাগ করিয়া ধীরভাবে চিন্তা করিতে শিখিতেছি। প্রথমতঃ পর্দ্দা-প্রথা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পূর্ব্বাপেক্ষা মোলায়েম হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রমাণ, আমাদের এক অধিবেশনে কয়েক জন ভদ্র মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন উচ্চ শিক্ষিতা মুসলমান নারীও ছিলেন। বলা বাহুল্য, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, এক নব জাগরণ আসিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের যুবক দল সমাজের আনন্দহীন অবস্থা তীব্র ভাবে অনুভব করিয়া, জীবনকে আর্টের ভিতর দিয়া একটু সরস করিয়া অনুভব করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাহার পর গত বৎসর কবি নজরুলের আগমনে তাঁহাদের আকাঙ্খা উদ্বেল হইয়া এই ঔৎসুক্য ও উৎসাহ কার্য্যে প্রকাশ পাইয়া অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এ বৎসর আমাদের সাময়িক অধিবেশন গুলিতে অনেক গুলি গান গাওয়া হইয়াছিল, এবং সুখের বিষয়, গায়কের কোন অভাব বোধ করা যায় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এমন কি গত বৎসরেও সঙ্গীতের কোন আয়োজন করিতে হইলেই, হিন্দু ভ্রাতৃদের অথবা বাহিরের লোকের সাহায্য লইতে হইত, কিন্তু এবৎসর প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে দুই তিনটি করিয়া গান হইয়াছিল, এবং তাহা আমাদের মুসলিম হলের ছাত্র-দিগের দ্বারাই গীত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আমরা যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে ও স্পষ্টভাবে আমাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেছি, কিছুকাল পূর্ব্বে তাহা অসম্ভব ছিল। এখন আমাদের চিন্তা-ধারার সহিত সংরক্ষণশীল আরবী শিক্ষিত সমাজের ভাবধারার সংমিশ্রণ হওয়ায়, বিচার-বুদ্ধি অনেকটা জাগ্রত হইয়াছে। আমার মনে হয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বর্ত্তমানে ঢাকার মৌলবী ছাত্রগণ (যাঁহারা স্থিতিশীল বলিয়া চির-পরিচিত) তাঁহারাও মুক্ত-বুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে হয়ত ঢাকার বাহিরেও অনেক তথাকথিত সাহিত্যিকদের চেয়েও অধিক অগ্রসর। আমাদের চেষ্টার এই প্রাথমিক ফল বাস্তবিকই আশাজনক, এবং ইহার পরিমাণও নিতান্ত সামান্য নহে। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুসলমান-জগতে উন্নতির

সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ; আমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া যতদূর সম্ভব, উচ্চতর সভ্যতাকে আহ্বান করিয়া আনিবার উপযুক্ত শক্তি ও মনোবৃত্তি অর্জ্জন করিতে হইবে।

গত বৎসর "শিখায়" যে একখানা ছবি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা যে, মসজিদ ও কোরাণ শরিফকে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিতে হইবে, উক্ত ছবিতে তাহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া, ছবিখানি যে অর্থে "শিখায়" সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল তাহাই সাধারণ্যে গোচর করিতেছি। ছবির বাম দিকে মরুভূমির উপর কয়েকটি খেজুর গাছ আছে। তাহাই মুস্‌লিম জ্ঞান ও সভ্যতার জন্ম-ভূমি। জ্ঞান ও সভ্যতার আগুন প্রথমে কিছু দিন ক্ষীণভাবে থাকিয়া, মুস্‌লিম-গৌরবের দিনে অতি উজ্জ্বল ও ব্যাপক ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তাহা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া অনেক দিন যাবত অন্ধকার ধূমমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল। অতি আধুনিক কালে সেই কুণ্ডলীকৃত ধূম-রাশির অগ্রভাগে আবার এক অগ্নি-শিখা দেখা যাইতেছে—ইহা দ্বারা ইসলামের নব জাগরণ সূচিত হইতেছে। ছবির ডান দিকে দেখুন, যে মসজিদ পূর্ব্বে জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ছিল, তাহা বর্ত্তমানে অন্ধকার পূর্ণ, এবং সেই অন্ধকারের ভিতর একখানা বন্ধ করা কোরাণ শরিফ রহিয়াছে, তাহা খুলিবার লোকটি পর্য্যন্ত নাই। আর ঐ মসজিদের চতুর্দ্দিকে জঞ্জাল আবর্জ্জনা পরগাছা প্রভৃতি স্পর্দ্ধার সহিত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইসলামের নবপ্রজ্জ্বালিত "শিখায়" আবার অন্ধকার স্থান আলোকিত হইবে এবং জঞ্জাল আবর্জ্জনা পুড়িয়া গিয়া কোরাণ ও মসজিদের সত্যরূপ উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইবে।

গত বৎসরের মত এ বৎসরও আমাদের কোন চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা নাই। ডেলিগেট ও অভ্যর্থনা-সমিতির মেম্বরদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, তাহা বার্ষিক অধিবেশনেই নিঃশেষ হইয়া যায়। এই সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গত বৎসর শ্রদ্ধেয় সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া আমাদের সমিতির সাহায্যার্থ পাঁচ টাকা দান করিয়াছিলেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সে-দান স্বীকার করিতেছি।

গত বৎসরের সভাপতি খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ এম-ইডি সাহেব এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ এ, এফ, রহমান সাহেব এ বৎসর এখানে নাই। এতদ্ব্যতীত আমাদের আরেকজন বিশেষ উদ্যোগী বন্ধু মৌলবী আনোয়ারুল কাদির সাহেবও অনুপস্থিত। আজকার দিনে তাঁহাদের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। তাঁহারা উপস্থিত থাকিলে বড় সুখের বিষয় হইত।

শ্রদ্ধাস্পদ কাজী ইমদাদুল হক মরহুমের জীবনেতিহাস সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা আমাদের একটি সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেবল কমিটি গঠন করা ছাড়া, এ কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে পত্র লিখিয়াও কোন সাড়া

পাওয়া যায় নাই। এরূপ নিশ্চেষ্টতা বড়ই দুঃখের বিষয়। আশা করি, ভবিষ্যতে এরূপ অবস্থা আর থাকিবে না।

আমাদের সাময়িক অধিবেশনে, খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ সাহেব, ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, খান সাহেব আব্দুর রহমান খাঁ এবং অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; শ্রীযুক্ত নলিনী ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌঃ মোমতাজ উদ্দীন আহমদ, মৌঃ মোঃ আবদুর রশীদ, কাজী নুরুল হক, মৌঃ আব্দুল ওদুদ, মৌঃ আমিনুর রসুল, মৌঃ নাজীর আহমদ, মৌঃ গোলাম মওলা, মৌঃ খোরশেদ উদ্দীন আহমদ, মৌঃ আব্দুল হক, মৌঃ নাজীর আহমদ, মৌঃ আলী নুর, মৌঃ এ, কে, আহমদ খাঁ, কাজী মহব্বত আলী, মৌঃ মুসলিম উদ্দীন খাঁ, মৌঃ শফিকর রহমান, মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন, মৌঃ ফয়েজ আহমদ, মৌঃ আব্দুল কাদের, মৌঃ আনোয়ারুল কাদির, এ, জেড্ নুর আহমদ, মৌঃ বেলায়েত আলী খাঁ, মৌঃ রজব আলী মজুমদার, মৌঃ আব্দুস সালাম, মৌঃ আব্দুস সালাম খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তৎসহ গায়কগণকে, প্রবন্ধ লেখকগণকে এবং প্রতিবারের উপস্থিত ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা না হইলে আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না। আশা করি ভবিষ্যতেও ইঁহাদের সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা ও উৎসাহের বলে আমাদের সাধনা ও আকাঙ্ক্ষা সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

الا ان نصر الله قريب ط

এখন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র মদদ অতি নিকটবর্ত্তী —কোরাণ

বাঙলার জাগরণ

—আবদুল ওদুদ

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা এই যে বাংলার জাগরণ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু পুরোপুরি সত্যও যে নয় সে-দিকটা ভেবে দেখবার আছে। যাঁরা এই জাগরণের নেতা তাঁরা কি উদ্দেশ্য-আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ও এই জাগরণের ফলে দেশের যা লাভ হ'য়েছে তা'র স্বরূপ কি, এই সমস্ত চিন্তা করলে হয়ত আমাদের কথা ভিত্তিশূন্য মনে হ'বে না। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার থেকে আরম্ভ ক'রে বাজনা ও গোহত্যা নিয়ে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা পর্য্যন্ত আমাদের দেশের চিন্তা ও কর্ম্মধারা, আর ডিইষ্ট এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট থেকে আরম্ভ করে' বোলশেভিজম্ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তা ও কর্ম্ম ধারা, এই দুইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে গেলেও বুঝতে পারা যায়—আমাদের দেশ তা'র নিজের কর্ম্মফলের বোঝাই বহন ক'রে চলেছে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে তা'র পার্থক্য যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য।—এই পার্থক্য একই সঙ্গে আমাদের জন্য আনন্দের ও বিষাদের। আনন্দের এই জন্য যে এতে করে' আমাদের একটা বিশিষ্ট সত্ত্বার পরিচয় আমরা লাভ করি—অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির মত আমরা শুধু ইয়োরোপের প্রতিধ্বনি মাত্র নই; আর বিষাদের এই জন্য যে আমাদের জাতীয় চিন্তা ও কর্ম্ম পরম্পরার ভিতর দিয়ে আমাদের যে ব্যক্তিত্ব সুপ্রকট হয়ে ওঠে সেটি অতীতের অশেষঅভিজ্ঞতা-পুষ্ট অকুতোভয় আধুনিক মানুষের ব্যক্তিত্ব নয়, সেটি অনেকখানি অল্পপরিসর শাস্ত্রশাসিত মধ্যযুগীয় মানুষের ব্যক্তিত্ব।

এই সঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে রামমোহন থেকে আমাদের দেশে যে নবচিন্তা ও ভাবধারার সূচনা হয়েছে পরে পরের চিন্তা ও কর্ম্মধারা কেবল যে তা'র পরিপোষক হয়েছে তা নয়, এমন কি প্রবলভাবে তা'র বিরুদ্ধাচারীই হয়েছে বেশী। আর উদ্দেশ্য আদর্শের এই সমস্ত বিরোধ একটা বীর্য্যবান সামঞ্জস্য লাভ ক'রে আমাদের জাতীয় জীবন ও কর্ম্মের যে একটা বিশিষ্ট ধারা সূচিত করবে তা থেকেও আমরা এখনো দূরে।

(২)

বাংলার নবজাগরণের প্রভাত-নক্ষত্র যে রাজা রামমোহন রায় সে সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নাই। কিন্তু তাঁকে জাতীয় জাগরণের প্রভাত-নক্ষত্র না ব'লে প্রভাত-সূর্য্য বলাই উচিত; কেননা, জাতীয় জীবনে কেবল মাত্র একটি নব চৈতন্যের সাড়াই তাঁর ভিতরে অনুভূত হয় না, সেই দিনে এমন একটি বিরাট নব আদর্শ তিনি জাতির সামনে উপস্থাপিত করে' গেছেন যে এই শত বৎসরেও আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই যাঁর আদর্শ

রামমোহনের আদর্শের সঙ্গে তুলিত হ'তে পারে। এমন কি, এই শত বৎসরে আমাদের দেশে অন্যান্য যে সমস্ত ভাবুক ও কর্ম্মী জন্মেছেন তাঁদের প্রয়াসকে পাদপীঠরূপে ব্যবহার ক'রে তা'র উপর রামমোহনের আদর্শের নব প্রতিষ্ঠা করলে দেশের জন্য একটা সত্যকার কল্যাণের কাজ হ'বে—এই আমাদের বিশ্বাস।

এই রামমোহন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ, ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। তবু একথা সত্য যে এই পাশ্চাত্য কৃষ্টির সংস্রবে তিনি এসেছিলেন পূর্ণ যৌবনে। তা'র আগে আরবী ফারসী ও সংস্কৃত অভিজ্ঞ রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বাদানুবাদ করেছেন, গৃহত্যাগ ক'রে তিব্বত উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছেন, আর সেই অবস্থায় নানক কবীর প্রভৃতি ভক্তদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—যাঁরা হিন্দু-চিন্তার উত্তরাধিকার স্বীকার ক'রেও পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এই সব ভেবে দেখলে ও তাঁর চিত্তের উপর মোতাজেলা সুফি প্রভৃতির প্রভাবের কথা স্মরণ করলে বলতে ইচ্ছা হয়, ভারতে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের সভ্যতা ও ধর্ম্মের সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন যে নানক কবীর দাদূ আক্‌বর আবুল ফজল দারাশেকো প্রভৃতি ভক্ত ভাবুক ও কর্ম্মীর দল, অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের রামমোহন তাঁদেরই অন্যতম। অবশ্য মধ্য যুগের সমস্ত খোলস চুকিয়ে দিয়ে একেবারে আধুনিক কালের এক পরম শক্তিমান মানুষের চিত্ত ক্রমেই আমরা তাঁর ভিতরে বেশী করে' অনুভব করতে পারছি। কিন্তু সেটি হয়ত তাঁর উপর আধুনিক কালের ইয়োরোপের প্রভাবের জন্যই নয়, আধুনিক ইয়োরোপ যেমন করে' মধ্যযুগেরই কুক্ষি থেকে উদ্গত হয়েছে রামমোহনের বিকাশও হয়ত সেই ধরণেরই ব্যাপার।

এই একটি লোক রামমোহন হিন্দুর সঙ্গে তর্ক করেছেন বেদ উপনিষৎ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ তন্ত্র সংহিতা ও সেই সমস্তের টীকা নিয়ে—মুসলমানের সঙ্গে তর্ক করেছেন কোর-আণ হাদিস ফেকা মন্তেক ইত্যাদি নিয়ে—আর খ্রীষ্টানের সঙ্গে তর্কে ব্যবহার করেছেন ইংরেজি গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল ও বড় বড় খ্রীষ্টান পণ্ডিতের মতামত। এই লোকটিই আবার সতীদাহ নিবারণের জন্য লড়েছেন—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, চীনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য, নারীর দায়াধিকার, বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজের শাসনের সমালোচনা ও সেই ক্ষেত্রে পথনির্দ্দেশ, এই একটী লোকেরই কর্ম্মের প্রেরণা যুগিয়েছে। এই বিরাট পুরুষের জীবন কথা ও বিভিন্ন রচনা আলোক পথের পথিক দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের নিত্য-সঙ্গী হ'বার যোগ্য। কিন্তু এই আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের দ্রষ্টব্য—দেশের সামনে কি নির্দ্দেশ তিনি রেখে গেলেন। সেই সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে বলতে পারা যায়, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দ্দেশ এক নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা, লোকশ্রেয়ঃ ও বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র—সেই জন্য পরে পরের উপশাস্ত্র সমূহ প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রত্যাবর্ত্তন মূল শাস্ত্র সমূহে; শিক্ষার ক্ষেত্রে, ইয়োরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশেষ

অনুশীলন ; সমাজের ক্ষেত্রে, লোক হিতকর অনুষ্ঠান সমূহের প্রবর্ত্তনা—যা অনিষ্টকর তা প্রাচীন হ'লেও বর্জ্জনীয় ; আর রাজনীতির ক্ষেত্রে, Dominion status-এর মতো একটা কিছুর আশা রাখা। এমনি ভাবে নানা আন্দোলনে সমগ্র দেশ আন্দোলিত করে' ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন, সেই যাত্রা তাঁর মহাযাত্রা।

(৩)

রামমোহন জাতীয় জীবনে যে সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তনার সঙ্কল্প করেছিলেন তা'র মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজ অনতিবিলম্বে ফল প্রসব করতে আরম্ভ করে। হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর নাম চির দিনের জন্য এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। এই ডিরোজিও যে গুরুর শিষ্য ফরাসী-বিপ্লবের চিন্তার-স্বাধীনতা-বহ্নি তাঁর ভিতরে প্রজ্জ্বলিত ছিল। ডিরোজিওর সেই বহ্নি-দীক্ষা হয়েছিল। অল্প বয়সে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জ্জন করে' কবি ও চিন্তাশীল রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হন, আর তিন বৎসর শিক্ষকতা করার পর সেখান থেকে বিতাড়িত হন। এরই ভিতরে তাঁর শিষ্যদের চিত্তে যে আগুন তিনি জ্বালিয়ে দেন তাঁর কলেজ পরিত্যাগের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত তা'র তেজ মন্দীভূত হয় নাই। শুধু তাই নয়, নব্যবঙ্গের গুরুদের ভিতরে এই ডিরোজিওর এক বিশিষ্ট স্থান আছে। এঁর শিষ্যেরা অনেকেই চরিত্র, বিদ্যা, সত্যানুরাগ ইত্যাদির জন্য জাতীয় জীবনে গৌরবের আসন লাভ করেছিলেন, এরই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের আচার-বিচার বিধি-নিষেধ ইত্যাদির লঙ্ঘন দ্বারা সুনাম বা কুনাম অর্জ্জন ক'রে সমস্ত সমাজের ভিতরে একটা নব মনোভাবের প্রবর্ত্তনা করেন।

ডিরোজিওর দলকে আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন রামমোহনের বিরুদ্ধ দল বলে', কেননা এই দল ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন ত ছিলেনই অনেক সময় নাস্তিক ভাবাপন্ন ছিলেন, আর "If we hate anything from the bottom of our heart it is Hinduism" একথা তাঁদের কেউ কেউ প্রকাশ্য ভাবেই ঘোষণা করতেন। তবু এই ডিরোজিওর দল প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ত রামমোহনের বিরুদ্ধ দল নয়। এই ডিরোজিওর দলের অনেকে উত্তর কালে রামমোহনের ব্রহ্মসমাজের নেতা ও কর্ম্মী হয়েছিলেন, আর বিদ্যা চরিত্রবল জনহিতৈষণা ইত্যাদি গুণে এঁরা যে ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছিলেন তাতে রামমোহনের বিদেহী আত্মার স্নেহাশিষই হয়ত তাঁরা লাভ করেছিলেন।

রামমোহন ইয়োরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞানের স্বাদ বাঙালী প্রকৃত প্রস্তাবে পায় ডিরোজিওর কাছ থেকে। এই স্বাদের চমৎকারিত্ব কত তা এই থেকে বোঝা যাবে যে বাংলার চির-আদরের মধুসূদন এই ডিরোজিও-প্রভাবের গৌণ ফল। তা ছাড়া সাধারণতঃ বিদ্যানুরাগী বাঙালী হিন্দু এই ডিরোজিও প্রদর্শিত-পথে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে যে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন তা বাস্তবিকই

প্রসংশনীয়। আজো বাঙ্গালী হিন্দুর বিদ্যানুরাগ কমে নাই, কিন্তু ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যদের সেই আন্তরিকতার লালিমা একটু কেমনতর হ'য়ে গেছে বৈ কি।

কিন্তু এত গুণ ও কার্য্যকারিতা সত্ত্বেও, স্বীকার কর্ত্তে হ'বে, ডিরোজিওর দল দুই এক পুরুষের বেশী প্রাণ ধারণ করে' থাকতে সমর্থ হন নাই, আর আজ তাঁরা বাস্তবিকই নির্ম্মূল হ'য়ে গেছেন। কেন এমন হয়েছে তা ভাবতে গিয়ে হয়ত বলতে পারা যায়, তাঁরা দেশের ইতিহাসকে একটুও খাতির করতে চান নাই—পবননন্দনের মতো আস্তো ইয়োরোপ-গন্ধমাদন এদেশে বসিয়ে দিতে তাঁরা প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে অন্য একটি কথাও ভাববার আছে। তাঁরা যাই কেন করুন না দীনচিত্ত তাঁরা ছিলেন না—তাঁদের কামনা ভাবনা বাস্তবিকই রূপ নিয়েছিল তাঁদের জীবনে। আর সেই ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যদের চাইতে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু যে সর্ব্বাংশে উন্নততর জীব তাও হয়ত সত্য নয়।—তবু সেই ব্যক্তিত্ব ও সুরুচি-সমন্বিত প্রাণবান সারবান অপেক্ষাকৃত সরলচিত্ত ডিরোজিও-দল আমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন কিনা কে জানে। কে জানে এত জাতি-সম্প্রদায়-বিখণ্ডিত এত শাস্ত্র-উপশাস্ত্র-ভার-ক্লিষ্ট এত পূর্ণাবতার-খণ্ডাবতার-নিপীড়িত বাঙালী-জীবন আবার কোনোদিন বল্‌বে কি না—Derozio, Bengal hath need of thee!

(৪)

রামমোহনের শ্রেষ্ঠ দান কি তা নিয়ে আগেও বাংলা দেশে তর্কবিতর্ক হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্যও যে সে তর্কবিতর্কের প্রয়োজনীয়তা চুকে গেছে তা নয়। তবে যে সমস্ত বাদ প্রতিবাদ হয়েছে তা'র মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বাদানুবাদই সুবিখ্যাত। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। হাফেজের যে সব লাইন তাঁর অতিপ্রিয় ছিল তা'র একটি এই—হর্‌গিজ মোহ্‌রে তু আজ্‌ লওহে দিল্‌ ও জাঁ ন বরদ্* তাঁর জীবনের সমস্ত সম্পদ-বিপদের ভিতর দিয়ে তাঁর এই প্রেমের পরিচয় তাঁর দেশবাসীরা পেয়েছেন। প্রথম জীবনেই যে পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হ'তে হয়েছিল তা কঠোর—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সর্ব্বস্ব দানে তিনি পিতৃঋণ হ'তে উদ্ধার পাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। সত্যের যাত্রাপথে "মহান মৃত্যুর" এমনিভাবে সম্মুখীন হওয়া সমস্ত বাঙালী-জীবনে এক মহা-ঘটনা যাকে বেষ্টন ক'রে বাংলার ভাবস্রোতের নৃত্য চলতে পারে—হয়ত চলেছে। কিন্তু গুহা-পথের যাত্রী হ'য়েও দেবেন্দ্রনাথ গভীরভাবে জ্ঞানানুরাগী ও সৌন্দর্য্যানুরাগী ছিলেন। তবু, সংসারনিষ্ঠা জ্ঞানানুশীলন সৌন্দর্য্যস্পৃহা সমস্তের ভিতরে ঈশ্বর-প্রেমই ছিল তাঁর অন্তরের অন্তরতম বস্তু। তাই তিনি যে রামমোহনকে মুখ্যতঃ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারকরূপে দেখবেন এ স্বাভাবিক।—কিন্তু অক্ষয়কুমার ছিলেন জ্ঞান-পিপাসু; সে পিপাসা এমন প্রবল যে এত দিনেও বাংলা দেশে সে রকম লোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অক্ষয়কুমার মত

* তোমার ছাপ আমার চিত্ত-ফলক থেকে কিছুতেই মুছ্‌বে না।

প্রকাশ করেছেন যে রাজার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার। জ্ঞানানুশীলন অক্ষয়কুমারের কাছে এত বড় জিনিষ ছিল যে এ ভিন্ন অন্য রকমের প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতেন না। তাঁর সেই সুবিখ্যাত সমীকরণ বাংলার চিন্তার ইতিহাসে অক্ষয় হ'য়ে আছে। শুধু প্রার্থনার যে কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা নাই তা প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি লিখেছেন—কৃষক পরিশ্রম করে' শস্য উৎপাদন করে প্রার্থনা করে' নয়। একেই তিনি একটা সমীকরণের রূপ দিয়েছেন এইভাবে :—

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য
পরিশ্রম = শস্য
∴ প্রার্থনা = ০

অক্ষয়কুমারের এই মনোভাব কিছুদিন ব্রাহ্ম সমাজে ও সেইদিনের ছাত্র মহলে কার্য্যকরী হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর প্রভাব ব্রাহ্ম সমাজে অক্ষুণ্ণ হয় নাই—হয়তো বা দেশের বৃহত্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই।

শেষ পর্য্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানই রামমোহনের পরে ব্রাহ্ম সমাজ গ্রহণ করেছিল; আর নানা বিপর্য্যয়ের পর আজো তাঁর নির্দ্দেশই হয়তো অধিকাংশ ব্রাহ্মের জীবনে কার্য্যকরী রয়েছে।

কারো কারো বিশ্বাস দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের যে রূপ দিয়েছিলেন তা রামমোহনের উদ্দেশ্য-আদর্শ থেকে পৃথক বস্তু। কিন্তু তা সত্য নয় এই জন্য যে যে-দ্বৈতবাদের উপর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি পত্তন করেছিলেন রামমোহনের জীবনে তা'রই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সত্য বটে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য অবলম্বন করেছিলেন; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে তাঁর মতভেদ বিস্তর; এমন কি, অধিকাংশ হিন্দু সাধক ও দার্শনিকের অবলম্বিত Pantheistic God-এর চাইতে হিব্রু প্রফেট্‌দের ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের নিয়ামক ঈশ্বরের দিকেই তাঁর চিত্তের প্রবণতা হয়তো বেশী ছিল। তবে রামমোহনের চিত্তের প্রসার ছিল অনেক বেশী, তাই ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে রূপ দিয়েছিলেন, কর্ম্মী জ্ঞানী ও অন্তঃপ্রবাহী-ভক্তিরস-সমন্বিত রামমোহনের বিরাট ইচ্ছাধারা তাতে অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হ'তে পারবে তা আশা করা সঙ্গত নয়। কোনো বড় স্রষ্টাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পুরোপুরি ধরা পড়েন নাই; রামমোহনের সূচিত ব্রহ্ম-সমাজ যদি তাঁর বিরাট চিত্তের প্রতিচ্ছবি না হ'য়ে থাকে তবে তাতে দুঃখ করবার বিশেষ কিছু নাই।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে রূপ দিয়েছিলেন তাতে যে শুধু তাঁর ভক্তি-উচ্ছ্বসিত চিত্তের তরঙ্গাভিঘাতই বুঝতে পারা গেছে তা সত্য নয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি নির্ণয়ে তিনি যে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তাতে দেশের চিত্ত-বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর একটা বড় আসন লাভ হয়েছে। প্রথমে বেদকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু

দেখা গেল বেদের সব-কিছু আশানুরূপ সুন্দর নয়। তারপর তিনি নির্ভর করতে গেলেন উপনিষদের উপর। সেখানেও মুস্কিল যে উপনিষৎ বহু, বহু রকমের, তা'র উপর শুধু দ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনই নয় অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনের সংখ্যাও তাতে কম নয়। এই সঙ্কটে জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমারের পরামর্শ মতো "আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" এর উপর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা হ'লো। এই ভাবে মানুষের চিত্তকে যে নূতন ক'রে এক গরীয়ান আসন দেওয়া হ'লো, তা'র অর্থ কত, ইঙ্গিত কি বিপুল, দুর্ভাগ্য ক্রমে বাংলার জাতীয় জীবনের সামনে থেকে আজ সে সব চিন্তা দূরে স্থিত। তাই জাতীয় জীবনে অক্ষয় কুমার—দেবেন্দ্রনাথের এই দানের জন্য তাঁদের প্রতি তাঁদের স্বদেশবাসীদের অন্তরের শ্রদ্ধা-নিবেদন আজো তেমন পর্য্যাপ্ত নয়।

(৫)

আমরা বলেছি বাংলায় এপর্য্যন্ত যে চিন্তা ও কর্ম্মধারার বিকাশ হয়েছে তাতে মধ্যযুগীয় প্রভাব বেশী। দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি মানুষের চিত্তকে ব্রহ্ম-পাদ-পীঠ বলে' সম্মান দিয়েছেন, শুধু প্রাচীন ঋষিদের যে কেবল সে অধিকার ছিল তা তিনি মানেন নাই।—কিন্তু এই আবিষ্কৃত সত্যের পূরো ব্যবহারে তিনি যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করেছেন। এই "আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" কথাটী তিনি পেয়েছেন উপনিষদ থেকে—নিজের জীবনের ভিতরে এ কথার সায় তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। কিন্তু অনন্ত প্রয়োজনতাড়িত মানুষকে এই অমৃতের সাধনা জীবনের সমস্ত কর্ম্ম সমস্ত অবসর সমস্ত প্রার্থনা সমস্ত অপ্রার্থনার ভিতর দিয়ে করতে হ'বে শুধু বিধিবদ্ধ প্রার্থনার ভিতর দিয়েই নয়—এতটা অগ্রসর হ'তে তিনি যেন পশ্চাৎপদ হয়েছেন। হয়তো বৃহত্তর মনীষা নিয়ে তিনি যদি অক্ষয়কুমারকে আত্মসাৎ করতে পারতেন তা হ'লে ব্রাহ্ম সমাজ তাঁর হতে যে রূপ লাভ করত তা দেশের পক্ষে আরো কল্যাণদায়ক হ'তো।

দেবেন্দ্রনাথের এই যে অন্তরে অন্তরে সেই ব্রহ্মোল্লাস অনুভব করা; সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে শ্রেয়ের অন্বেষণ ক'রে যাবে, সে অন্বেষণে মুখের প্রার্থনার প্রয়োজন সে অনুভব করতে পারে, নাও পারে ;—অনন্ত কর্ম্ম ও প্রেমপুলকিত মানুষের জীবনে তা'র আরাধ্য হয়তো তা'রই জীবনের সুরভি, হয়তো তা'র জ্ঞান নেত্রে বিশ্বজগতের নিয়ামক, হয়তো বিশ্বজগতের জন্য তা'র প্রেমের বন্ধন, হয়তো কর্ম্ম ক্ষেত্রে তা'র চিরজাগ্রত নেতা—অক্ষয়কুমারের ভিতর দিয়ে উৎসারিত এই আধুনিক মনোভাবকে যে তিনি তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেন নাই, এই খানেই তাঁর মধ্য যুগীয়ত্ব; এবং আধুনিক জীবনোপযোগী জ্ঞানানুরাগ সুমার্জ্জিত জীবন-যাপন ইত্যাদি সত্বেও তিনি যে বৃদ্ধবয়সে ভাবের আতিশয্যে নৃত্য করতে পেরেছিলেন হয়তো তাঁর এই প্রগল্‌ভা মধ্য-যুগীয় ভক্তিই তা'র কারণ। অবশ্য মধ্য যুগীয় ব'লে সে জিনিবটী যে তাচ্ছিল্য বা অসম্ভ্রমের চক্ষে আমরা দেখতে প্রয়াস পাচ্ছি সে কথা মনে করলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হ'বে।

এখানে শুধু এই কথাটি আমরা বলতে চাচ্ছি যে এত চেষ্টা সত্ত্বেও আধুনিক অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার সামর্থ্য যে আমাদের হচ্ছে না তা'র এক বড় কারণ— আমাদের যাঁরা নেতৃ-স্থানীয় তাঁরাও খুব কমই আধুনিক জীবনের দিকে তাকিয়েছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হন। তাঁর উপর খৃষ্টের জীবন ও বাইবেলের প্রভাব বিশেষ রূপে কার্য্যকরী হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির যে বিশেষ পার্থক্য ছিল অনেকেই সে কথা বলেছেন। কিন্তু এক জায়গায় বড় গভীর মিলও ছিল, সেখানে হয়তো কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথেরই মানস-পুত্র—সেটি প্রগল্‌ভা ভক্তি। দেবেন্দ্রনাথ রাশভারী লোক ছিলেন, তাই তাঁর অন্তরের এই প্রগল্‌ভা ভক্তি তাঁর বাইরের চেহারা কচিৎ আলুথালু করতে পেরেছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র আজন্ম "অগ্নি মন্ত্রে"র উপাসক; এই প্রগল্‌ভা ভক্তি তাঁকে প্রায় সব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির দিকে নিয়ে গেছে, নিত্য নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে, আর শেষে জগতের সমস্ত ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করে' এক "নব বিধান" বা নব ধর্ম্মের পত্তনে অনুপ্রাণিত করেছে। কেশবচন্দ্র যে শেষ বয়সে পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলেন সেটি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। বাংলার চির-পরিচিত প্রগল্‌ভা ভক্তি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার এই এক অদ্ভুত পুরুষ রামকৃষ্ণের জীবনে আশ্চর্য্য পরিনতি লাভ করেছিল; যাঁর প্রেরণায় কেশবচন্দ্র আজীবন নানা পথে ছোটাছুটি করেছেন তা অমন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কারো ভিতরে সঞ্চিত দেখ্‌তে পেলে সেখানে তিনি যে নিজেকে বিকিয়ে দেবেন এ যেমন স্বাভাবিক তেম্‌নি সঙ্গত।

(৬)

সব ধর্ম্মই কি সত্য? এ প্রশ্নের মীমাংসায় রামমোহন বলেছিলেন—বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে পরস্পর-বিরোধী অনেক নিত্যবিধি বর্ত্তমান, তাই সব ধর্ম্মই সত্য একথা মানা যায় না, তবে সব ধর্ম্মের ভিতরেই সত্য আছে। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এই মীমাংসা মেনে চলেছিলেন বল্‌তে পারা যায় যদিও উপনিষদের দিকে তিনি বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু কেশব-চন্দ্রের ভক্তিপ্রধান প্রকৃতির কাছে রাজার এ মীমাংসা ব্যর্থ হলো। তিনি বললেন—Our position is not that there are truths in all religions, but that all established religions of the world are true. এই কথাই রামকৃষ্ণ আরো সোজা করে' বল্‌লেন—যত মত তত পথ।—যত মত তত পথ ত নিশ্চয়ই; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—সে সব পথ একই গন্তব্য স্থানে নিয়ে যায় কি না। রামকৃষ্ণ বল্‌লেন—হাঁ তাই যায়, তিনি সাধনা করে দেখেছেন শাক্ত বৈষ্ণব বেদান্ত সুফী খ্রীষ্টান ইত্যাদি সব পথই এক "অখণ্ড সচ্চিদানন্দের" অনুভূতিতে নিয়ে যায়। এ সব কথার সামনে তর্ক বৃথা। তবে এই একটী কথা বলা যেতে পারে যে মানুষ অনেক সময়ে বেশী ক'রে যা ভাবে চোখেও সে তাই দেখে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেউ বলেছেন অবতার, কেউ বলেছেন উন্মাদ। কিন্তু যিনি যাই বলুন বাংলার হিন্দু-চিত্তের উপর তাঁর কথার প্রভাব যে অত্যন্ত বেশী তাতে সন্দেহে নাই। পৌরাণিক ধর্ম্মকে সরিয়ে দিয়ে তা'র স্থানে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু জনসাধারণের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে—পৌরাণিক ধর্ম্মের কিছুই বাজে নয়, তা'রই পরতে পরতে রয়েছে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, হয়তো বা তা'র চাইতেও ভাল কিছু।

(৭)

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মচর্চ্চার উপরে যে একটা মধ্যযুগীয় ছাপ মারা রয়েছে তা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাংলার নববিকশিত সাহিত্যে যেন এই ক্রটীর স্খলনের চেষ্টা প্রথম থেকেই হ'য়ে আসছে। বাংলার নবসাহিত্যের নেতা মধুসূদন আশ্চর্য্য উদার চিত্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; জাতি ধর্ম্ম ইত্যাদির সংকীর্ণতা যেন জীবনে ক্ষণকালের জন্যও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই; আর এই উদারচিত্ত কবি ইয়োরোপের ও ভারতের প্রাচীন কাব্য-কলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে ভাবে অবলীলাক্রমে আহরণ করে' তাঁর স্বদেশবাসীদের উপহার দিয়েছেন সে কথা বাঙালী চিরদিনই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।—তাঁর পরে সাহিত্যের যে নেতা বাঙালী জীবনের উপর একটা অক্ষয় ছাপ রেখে গেছেন তিনিও প্রথম জীবনে শিল্পী সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা অস্পৃষ্ট। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে কবিজনসুলভ স্বপ্ন কম। তিনি বরং নিপুণ চিত্রকর ও বাস্তববাদী স্বদেশ প্রেমিক। তাই তাঁর যে অমর কীর্ত্তি "আনন্দ মঠ" তাতে হয়ত নায়ক নায়িকার গূঢ় আনন্দ বেদনার রেখাপাত নাই, হয়ত এমন কোনো সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি আঁকা হয় নাই যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' মানুষের নয়নে প্রতিভাত হ'বে a thing of beauty আর সেই জন্য a joy for ever; কিন্তু তবু এটি অমর এই জন্য যে এতে যেন লেখক কি একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতায় পাঠকের সামনে প্রসারিত করে' ধরেছেন দেশের-দুর্দ্দশা-মথিত তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়—যে হৃদয় তাঁর সুগভীর বাস্তবতার জন্যই সৌন্দর্য্যের এক রহস্যময় খনি!

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত শিল্পের ক্ষেত্রে থাকতে পারেন নাই; শেষ বয়সে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তিনি অবতরণ করেছিলেন। তাঁর চরিতাখ্যায়করা বলেন, শেষ বয়সে আত্মীয় বিয়োগে অধীর হ'য়ে তিনি ধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু কৃষ্ণ চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রমস্বীকার করেছেন, যে সুবৃহৎ আদর্শ স্বজাতির সামনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, তাকে আর্ত্তের কর্ম্ম না বলাই সঙ্গত।—বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্ম্মালোচনায়ও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর দেশহিতৈষণা। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত দেশের অগ্রগতিকে খানিকটা সাহায্য করলেও বেশী সাহায্য করতে পারে নাই; কেননা দেশ বলতে কেমন ক'রে তিনি বুঝেছিলেন দেশের হিন্দু—তাও আবার সকল হিন্দু নয়, সমসাময়িক সংস্কারকদের হাতে যে হিন্দু কিছু দিশাহারা হ'য়ে পড়েছিল

সেই হিন্দু। এখানেও তাঁর সেই স্বদেশ প্রেম ;—কিন্তু এ প্রেম খুব গভীর হ'লেও কিছু একরোখা, তাই শেষ পর্য্যন্ত জাতির ত্রাণকর্ত্তার বড় আসন তাঁর স্বদেশবাসীরা হয়তো তাঁকে দিতে পারবেন না।

জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধনায় রামমোহনের সুর শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পশ্চাদবর্ত্তীরা রাখতে পারেন নাই ; সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেম্নি মধুসূদন যে গ্রামে সুর ধরেছিলেন তা নেমে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রই যখন নিজেকে দেশের কল্যাণের রাজপথে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলেন না "অন্যে পরে কা কথা"। তাই তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনার পরিমাণ যতই বেশী হোক, দশের করতালিতে যতই তাঁদের সাহিত্যিক জীবন মুখরিত হ'য়ে থাকুক, বাংলার চিত্তের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য তাঁরা কিছুই করতে পারেন নাই বল্‌লে চলে ; বরং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যে মধ্যযুগীয় ভাবোন্মত্ততা সুপ্রকট হ'য়ে উঠ্‌ল, নানা ভাবে তাকেই তাঁরা প্রদক্ষিণ করেছেন।

(৮)

কিন্তু বাংলা দেশ এমনিতর একটা প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়েই চলেছে, বৃহত্তর জীবনের দিকে তা'র গতি-রুদ্ধ, এতটা বলতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হ'বে। রামমোহন যে কর্ম্ম ও চিন্তার সূচনা ক'রে গেলেন ও তাঁর পরে কেশবচন্দ্র—বঙ্কিমচন্দ্র—রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে তা'র যে একটি প্রতিক্রিয়া হ'লো, এসব বিরোধ কোনো এক বীর্য্যবান সামঞ্জস্যে উপনীত হয় নাই, ও তার জন্য বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে ও কর্ম্মধারা একটা সুদর্শন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে নাই, এ সত্য ; কিন্তু এ বিরোধ চুকিয়ে দিয়ে একটা উদার বীর্য্যবন্ত জাতীয়তার দিকে চোখ কারোই যে নাই তা সত্য নয়। জাতির এ নব প্রয়োজন দুইজন চিন্তা ও কর্ম্ম-বীরের জীবনের ভিতর দিয়ে ফুটেছে—একজন বিবেকানন্দ অপর জন রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ পরম-হংস রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি ব্যাপারটা আমরা বুঝি আর নাই বুঝি কিন্তু এ সত্য যে তিনি বার বার জোর দিয়েছেন জগৎ-হিতের উপর। এ উপেক্ষা ক'রে বিবেকানন্দ মুক্তির প্রার্থী হয়েছিলেন, তার জন্য তিনি তাঁকে ধিক্কার দিয়ে-ছিলেন। বিবেকানন্দের ভিতরে দোষ কম নয়,—প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের "গোরা"র মতো সব সময়ে তিনি যেন বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে লড়বার জন্য তৈয়ার, দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাস ও বেদান্তের তিনি গোঁড়া, তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মদের যে তিনি নিন্দা করেছেন তাদের ঐতিহাসিক বোধ নাই বলে' সে অভিযোগটি তাঁর সম্বন্ধেও খাটে—ব্রাহ্মদের সংস্কারের প্রয়াসের কোনো অর্থ তিনি যেন পান নাই, অথচ তিনি নিজে একজন ছোট-খাট সংস্কারক ছিলেন না ; চতুর্থতঃ ভারত আধ্যাত্মিক ইয়োরোপ জড়বাদী, ভারতকে ইয়োরোপের আচার্য্য হ'তে হ'বে, এই ধরণের কতকগুলো কথা প্রচার করে' স্বজাতির অন্তঃসারশূন্য দম্ভের সহায়তাই তিনি বেশী করেছেন ;—তবু মোটের উপর এই বীরহৃদয় সন্ন্যাসী সত্যকার স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন-হয়তো মানব প্রেমিকও ছিলেন।

তাই সেবাশ্রম প্রভৃতির সূচনা করে' জাতীয় জীবনে তিনি যে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করেছেন জাতির চিত্ত-প্রসারের জন্য বাস্তবিকই তা অমূল্য; এবং জাতীয় জীবনের দৈন্যের জন্য নানা ত্রুটী বিচ্যুতি সত্বেও এই সব প্রতিষ্ঠান বাংলার হিন্দু যুবককে দেশের সত্যকার সন্তান হ'তে যে অনেকখানি সাহায্য করছে তাতে সন্দেহ নাই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার যে রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা'র সঙ্কীর্ণতা ভেঙে তাকে বৃহত্তর করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদর্শের অনুপ্রেরণা এ পর্য্যন্ত বাংলার জাতীয় জীবনে কমই অনুভূত হয়েছে; এখন পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ত্বের আদর্শই দেশের জন-সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে' রয়েছে, বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাও আবার সূক্ষ্ম-শিল্পী গীতি কবি; তাই যে মহা-মানবতার গান তিনি গেয়েছেন আমাদের দেশের স্থূল-প্রকৃতি জন-সাধারণের জীবনে কত দিনে তা'র স্পন্দন জাগবে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

(৯)

হিন্দুর নিজের ভিতরেই মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের সংগ্রামের যখন এই চেহারা,—তখন আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে ভাবে উঠেছে তা একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের দুর্দ্দশার প্রমাণ। মুসলমানের দুর্দ্দশা এই জন্য যে এ সংগ্রামে সে যে ভাবে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখে তা থেকে বুঝতে পারা যায় তা'র স্বপ্ন দেখারই অবস্থা। বাস্তবিক মুসলমানের অবস্থা খুবই বিস্ময়কর—এতদিন ধরে' পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাস ক'রেও তন্দ্রার ঘোরে দুই একটী প্যান ইসলামী বোলচাল দেওয়া ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ জাগ্রত-চিন্তার পরিচয় সে আজ পর্য্যন্ত দেয় নাই!—আর হিন্দুর জন্য আফ্‌সোসের এই জন্য যে তা'র এত সংস্কার-চেষ্টা এত সাধনা সত্বেও এই সমস্যার একটা মীমাংসা করবার সামর্থ্য তা'র হ'লো না। এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যেন হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে বিধাতার জ্বালা এক তীব্র আলো,—এর ঔজ্জ্বল্যে আমরা দেখে নিতে পারছি—বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎসবে আমাদের স্থান কোথায়।

বাংলার যে প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তা অনেক সময়ে এমন সামান্য কারণে হয়েছে যা থেকে বুঝতে পারা যায় প্রাচীন সংস্কার বাঙালীর জীবনে কত বদ্ধমূল—চোখ খুলে' জগতকে দেখ্‌তে সে কত নারাজ। এরই সঙ্গে এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে বাঙালী এ পর্য্যন্ত তার চোখ খোলার সাধনার বড় সাধক রামমোহনকে মোটের উপর প্রত্যাখান করে' এসেছে।—এই প্রত্যাখ্যানের কারণ সম্বন্ধে দুটি কথা বলা যেতে পারে,—প্রথমতঃ বাঙালী সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ, আর রামমোহন লোকটি যেন আগা-গোড়া নিরেট কাণ্ডজ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ বাঙালী হিন্দুর পরম আদরের প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তিনি বেশ উঁচু গলায় কথা বলেছেন।—এই প্রতিবাদকারী অথচ মহাপ্রাণ রামমোহনকে বাঙালী হিন্দু শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবে গ্রহণ

করবে বলা সহজ নয়। কিন্তু বিশ্ব-জগতের দিকে বাস্তবিকই যদি তা'র চোখ পড়ে তা'হ'লে সে হয়ত দেখবে—এই প্রতিবাদ কারীরকথার ভিতরেই সত্যের পরিমাণ বেশী, তাই তাঁর পথ-নির্দ্দেশই অনেক পরিমাণে কল্যাণ পথের নির্দ্দেশ। তা ছাড়া রামমোহনকে গ্রহণ করা বাঙালী হিন্দুর জন্য সে শুধু আয়াস-সাধ্যই হ'বে এটি সঙ্গত নয় এই জন্য যে রামমোহনও বাঙালী সন্তান, শুধু তাই নয়, তাঁর বিশাল দেহের ভিতরে যে চিত্তটি ছিল সমস্ত অভিনবত্ব সত্বেও তা বাঙালীরই কোমল চিত্ত।

মনে হয়, বাঙালীর রামমোহনকে গ্রহণ করার সব চাইতে বড় অন্তরায় এইখানে যে সে সাধারণতঃ ঘর-মুখো আর রামমোহন আবাল্য ঘর-মুখো ছিলেন না। এই বাহির-মুখো হওয়ার সাধনাই হয়ত বর্ত্তমান বাঙালী জীবনে বড়ই সাধনা—হয়ত এরই সাহায্যে সবলতর কাণ্ডজ্ঞান শ্রেষ্ঠতর পৌরুষ ইত্যাদি কল্যাণ-পথের সম্বল আহরণ তা'র পক্ষে সহজ হ'বে। আর এই বাহির-মুখো হওয়ার উপায়ও তার অতি নিকটে। দৈব ঘটনায় বহু জাত বহু সম্প্রদায় দেশের বুকে এক জায়গায় মিলেছে, সেই মিলনকে অন্তরের দিক দিয়ে সার্থক ক'রে তোলাই হচ্ছে বাহির-মুখো হওয়ার বড় উপায়—বাঙালীর সৌভাগ্য-রূপী তার এ যুগের কবি বার বার একথা বলেছেন।

এরই সঙ্গে মুসলমানের সত্যকার জাগরণ যদি সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ তার নিজের ধর্ম্মাদর্শ ও সভ্যতার ভিতর থেকে এক নব জীবনের প্রেরণা সে যদি লাভ করতে পারে, তাহলে কিছু বেশী সুফল লাভের সম্ভাবনা। যে গুরু তা'কে উপদেশ দিয়েছেন—ক্ষুধা লাগ্‌লে খেয়ে নামাজ পড়ো, তাঁর অনুবর্ত্তিতায় বস্তুতন্ত্র হওয়া তা'র পক্ষে স্বাভাবিক। আবার সেই জন্যই বস্তুর শিকলে বন্দী হওয়াও তা'র পক্ষে কমঃ স্বাভাবিক নয়। ফলে মুসলমানের হয়েছেও তাই।—এই মনের বন্ধন সহজ ভাবে চুকিয়ে দিয়ে মুসলমান নব মানবতার ধ্বজা বহন করবার যোগ্য হ'বে কিনা, অথবা কতদিনে হ'বে, জানি না। যদি হয়, তবে বাংলার কর্ম্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে তার দা'ন কম হ'বে না—তা হ'লে স্বাপ্নিক হিন্দু ও বস্তুতন্ত্র মুসলমান এ দুয়ের মিলনে বাংলার যে অভিনব জাতীয় জীবন গঠিত হ'বে—তার কীর্ত্তি-কথা বর্ণনা করবার ভার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকের উপর থাকুক।

সমবায় আন্দোলনে মুসলমানের কর্ত্তব্য

—কমরুদ্দীন আহমদ (খান বাহাদুর)

কোরানের সুরা আল্-হজরাতে বলা হইয়াছে যে, "হে মানব, আমি তোমাদিগকে পুরুষ ও স্ত্রী, বিভিন্ন পরিবার এবং বংশে বিভাগ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, তোমাদিগের পরস্পরের সহিত যেন পরিচয় ও ঘনিষ্টতা জন্মে। বস্তুতঃ আল্লার নিকট সেই ব্যক্তিই সাতিশয় প্রিয় যে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী"। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য সমাজের প্রত্যকই পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃভাব ও সখ্য স্থাপন করিয়া তাহার সেবায় ও যত্নে আত্মনিয়োগ করিবে—ইহাই মুসলমানের ধর্ম্ম পুস্তক কোরানের উপদেশ বাণী। আমরা ইতিহাস ও ধর্ম্ম পুস্তকে দেখিতে পাই যে, যুগে যুগে এই ধর্ম্মোপদেশের মহিমা উপলব্ধি করিয়া এই মানব-সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আমাদিগের হজরত রসুলও এই ধর্ম্মবাণী অনুসরণ করিয়াই জগতে শান্তি ও ভ্রাতৃ-ভাবের মহিমা প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যখন দুর্দ্দান্ত আরব জাতি একে অন্যকে হিংসা করিয়া, পশুবৎ আত্ম কলহে উন্মত্ত হইয়া ধ্বংশের পথে অগ্রসর হইতেছিল, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য একে অন্যের রক্তপাত করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিল না; তখন আমাদের পবিত্র রসুল তাঁহার অমূল্য উপদেশ দানে তাহাদিগের মধ্যে যথার্থ ভ্রাতৃভাব স্থাপনে সমর্থ হইয়া সমবায় সঙ্ঘ ও একতার অলৌকিক শক্তি জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন সমবায় একেবারে সম্পূর্ণ বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী, মুসলমান যুগে সমবায় ছিল না বা আমাদের ধর্ম্ম পুস্তক কোরানে সমবায়ের উল্লেখ বা সমর্থন নাই এবং সেই হেতু সমবায়কে সন্দেহের চক্ষে দেখেন এবং অন্যের নিকটও সমবায়ের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন আমি তাঁহাদিগকে সমবায়ের স্বরূপ অবগত হইতে অনুরোধ করি; তাহা হইলে যাহারা শাস্ত্রানুশীলন করিয়া থাকেন তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম পুস্তকে সমবায় নীতির বহু স্থানে উল্লেখ ও সমর্থন ও ইহার বহুল প্রচারের উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। তাঁহাদিগের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এবং আমার মুস্লিম ভ্রাতৃ বৃন্দকে সমবায় শিক্ষা ধর্ম্ম-শিক্ষারই যে একটি অঙ্গ, একথা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত ভাবে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনের জন্য রসুল যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, যে পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বজাতির ও স্বধর্ম্মীর মুক্তির পথ সুগম করিয়াছিলেন, তাহা কি বর্ত্তমানে প্রচলিত সমবায় নীতিরই অনুরূপ নয়? একবার আপনারা ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের সেই স্মরণীয় দিনের কথা মনে করুন, যেদিন তিনি গভীর রজনীতে আক্‌রবা পর্ব্বতোপরি ১২ জন

আনসারিয় সহিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞার শর্ত্তগুলি কি বর্ত্তমান যুগের অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমবায় নীতিরই সম্পূর্ণ অনুরূপ নয়? বর্ত্তমানে যেমন সম অবস্থাপন্ন ১০।১৫টি লোক একত্র হইয়া, প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করিয়া, একে অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, পরস্পর সমভাবে দায়ী হইয়া কার্যাক্ষেত্রে অগ্রসর হয় সেইরূপ ঐ ১২ জন আনসারী ও আমাদের রসুল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় সকল সময়ে তাঁহারা এক হইয়া কার্য্য করিবেন। এক সুতায় গাঁথা মালায় যেমন ফুলের অস্তিত্ব পৃথক ভাবে লোপ হইয়া যায় এবং ভেদের অবসানে মালারই সৃষ্টি হয়, তেমনি তাহাদের একত্ব ঘুচিয়া একতার সৃষ্টি হইয়াছিল। সমবায় সমিতির অসীম দায়িত্বের কথা শুনিয়া যাঁহারা চমকাইয়া উঠেন, তাঁহারা একবার আকাবা পাহাড়ের মিলন গ্রন্থির কথা মনে করিবেন; সমবায়ে আর তাঁহাদের বিতৃষ্ণা আসিবে না; অসীম দায়িত্বের নামে আর তাঁহারা চমকাইয়া উঠিবেন না। বাস্তবিক পক্ষে সমবায় নীতি চির-দিনই মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত এবং সমবায়ই মানব সমাজে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের ও এককালে স্বকীয় ও পরকীয় উন্নতি সাধনের একটি শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই রসুলের নির্দ্দেশিত পথ অনুসরণ না করিয়াই মুসলমান সমাজ আজ এমন ভাবে স্বকীয় গৌরব নষ্ট করিতে বসিয়াছে।

এই ত গেল ইসলামে অসীম দায়িত্বের একটি উদাহরণ। রসুল ও তাঁহার সঙ্গীগণ যে উপরোক্ত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সমবায় ক্রয় বিক্রয় সমিতির অনুরূপ সমিতিও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন মক্কা হইতে মদিনায় গমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। দারিদ্র্যের তীব্র দংশনে জর্জ্জরিত হইয়াও তাঁহারা আপাত-মধুর পাপ লব্ধ সমৃদ্ধির কামনা করেন নাই। খোদার অজস্র আশীষ বারি যাঁহার উপর নিয়ত বর্ষিত হইতেছিল সেই রসুলের গৃহে একদা একজন অতিথি আসিয়াছিলেন। তিনি খাদ্যের অভাব বশতঃ অতিথি সৎকারে অসমর্থ হইয়া আবুতালহা নামক তাঁহার একজন প্রতিবেশীকে ঐ অতিথির অভ্যর্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। আবুতালহাও রসুলের সম অবস্থাপন্ন, তাঁহার গৃহেও মাত্র এক ব্যক্তির উপযোগী আহার্য্য ছিল। তিনি তাঁহার সমস্তই ঐ অতিথিকে দান করিয়া নিজে অভুক্ত রহিলেন এবং অতিথির প্রীতির জন্য অনশন জনিত বিষাদ দূর করিয়া সুমধুর হাস্যের সহিত তাহাকে সেবা করিতে লাগিলেন। দারিদ্র্যের এমন নিষ্ঠুর উপহাস অথচ ত্যাগের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। এমন দিনেও তাঁহারা আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাস হারান নাই, তাঁহার পরম শক্তিতে বিশ্বাসহীন হন নাই। তাঁহারা খোদার দয়ায় নির্ভর করিয়া আত্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া, মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন "ইয়া কানা বোদো ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন" অর্থাৎ হে আল্লা, আমরা তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং তোমার

নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।" এই প্রচণ্ড বিশ্বাস-বলেই তাঁহারা জগতে শান্তি-ধর্ম্ম স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মক্কাবাসীরা ছিলেন বাণিজ্য-ব্যবসায়ী এবং মদিনাবাসীরা ছিলেন কৃষি-ব্যবসায়ী। আবদুর রহমান বেনউক নামক এক ব্যক্তি আনসারিদিগের কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, কেবল মাত্র আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, মদিনাবাসীদিগের সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্য যাহা পূর্ব্বে নানা জাতীয় ব্যবসায়ীদিগের মধ্যস্থতায় রপ্তানি করা হইত, তাহা তিনি একত্রে রপ্তানি করিতে লাগিলেন এবং সিরিয়া প্রদেশ হইতে যেখানে ঐ সকল কৃষি-জাত দ্রব্য বিক্রয় হইত, সেখান হইতে মদিনাবাসীদিগের ব্যবহারের জন্য পণ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই প্রকারে ক্রয় বিক্রয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা দ্বারা যাহা লাভ হইতেছিল তাহার এক অংশ বায়তুলমালে জমা করিতে লাগিলেন। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার ফলে অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদিগের এরূপ বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছিল যে তাহারা সামান্য দীন ভিখারী হইয়াও প্রবল পরাক্রমশালী কোরেশদিগের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন।—বদোর, ওহোদ, আহোযাব ও হোনানের যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁহাদের অলৌকিক শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সেই বিক্রম-কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে এই প্রকার উন্নতির মূলে একমাত্র সমবায় শক্তিই নিহিত ছিল। এই কার্য্যে স্বার্থান্বেষণ নাই, স্বার্থ ত্যাগ আছে, ইহাতে আত্মম্ভরিতা নাই পর-সেবা আছে, ভ্রাতৃ বিদ্বেষ নাই, ভ্রাতৃ-ভাব আছে; তাই এই উন্নতি এত দ্রুত ও সুনিশ্চিত। এ মিলনে আল্লার আশীর্ব্বাদ আছে, এ মিলন এ সঙ্ঘ, এ সমবায় তাহারই দান। স্বার্থ-ত্যাগ চিরদিনই খোদার নিকট আদরের জিনিষ—আমরা যখন উপাসনা আরম্ভ করি, তখনও সর্ব্ব-প্রথমে স্বীয় স্বার্থকে মন হইতে দূর করিয়া পরম করুণাময় আল্লার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচলিত সমবায়নীতি ও ভারতে প্রচলিত সমবায়ের বিধি-ব্যবস্থা যে ইসলামের অনুমোদিত ও পবিত্র কোরাণ-সঙ্গত তাহা আমার মুস্‌লিম ভ্রাতৃবৃন্দ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সমবায়ে কত মহাশক্তি নিহিত আছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা হইতে অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন। এই সমবায়-শক্তি বলেই আজ হইতে প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রসুল ও তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মী সঙ্গীগণ আত্মোন্নতি, সমাজ সেবা, ও লোক শিক্ষার অলৌকিক দৃষ্টান্তে জগতকে বিস্ময়ে অভিভূত করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে সমগ্র পৃথিবীতে এক মহা উদার শান্তিপূর্ণ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবপূর্ণ পুণ্যময় সত্য-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া পরম পিতা আল্লার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

এখন সমস্যা উঠিতে পারে যে সমবায় যদি ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই অঙ্গ-স্বরূপ, পবিত্র কোরা-নেও যদি সমবায় নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে তবে আবার মুসলমানের নিকট

বর্ত্তমান সমবায় আইনের বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? কিন্তু যুগ-ধর্ম্মকে আমরা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। সমবায় সর্ব্বতোভাবে ইস্‌লামের অনুমোদিত সুতরাং দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় ভারতের সমবায় আইনের যে বিধি-ব্যবস্থা আছে তাহাই এখন ভারতীয় মুসলমানগণকে অনুসরণ করিতে হইবে এবং ইহা ইস্‌লাম বিরুদ্ধ হইবে না। যদি কেহ ইস্‌-লামের দোহাই দিয়া সমবায়কে ঘৃণা বা উপেক্ষা করিতে চান্ বা সমবায়ের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়া ইসলামের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার ভাণ করেন তবে তাঁহার মতকে আমরা প্রকৃত ইস্‌লাম নামে অভিহিত করিতে পারি না। প্রকৃত ইস্‌লাম শান্তিপূর্ণ, ভ্রাতৃত্ব ও ত্যাগের আদর্শে মহিমান্বিত। ইস্‌লামে সঙ্কীর্ণতা নাই; উদারতা আছে। ইস্‌লামকে যদি আমরা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই; কতকগুলি বাহিক আকার ও রীতি-পদ্ধতির পরিপালনই যদি ইস্‌লাম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা ইস্‌লাম নয় তাহাকে আমরা পৌত্তলি-কতারই নামান্তর বলিয়া মনে করিতে পারি।

সার্ব্বজনীন উদার ইস্‌লাম ধর্ম্মের এই প্রকার অপ্রকৃত ব্যাখ্যায় ও স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচেতা উপদেষ্টাগণের ভ্রান্ত মত প্রচারের ফলেই আজ ইস্‌লামের নামে নানাবিধ অবান্তর জিনিষের আমদানী হইয়াছে। যদি আমরা মুস্‌লিম ভ্রাতৃবৃন্দ মনে প্রাণে সত্য-ধর্ম্ম পরম পবিত্র-ইস্‌লামেরই অনুশাসন মানিয়া চলিতাম, যদি আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহারই অনুমোদিত ধর্ম্ম-পথ হইতে বিচ্যুত না হইতাম তবে আমাদের বিরাট মুসলমান সমাজ আজ এই হীন অবস্থায় পতিত হইত না। আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন—"আমি কাহারও অবস্থা পরিবর্ত্তন করি না যে পর্য্যন্ত সে তাহার অবস্থা নিজে পরিবর্ত্তন না করিয়াছে।"

ভ্রাতৃবৃন্দ! কারণ ব্যতীত জগতে কোন কাজই সম্ভবপর হয় না। আমাদেরই দুর-বস্থার একমাত্র কারণ যে আমাদের বিকৃত মনোভাব, তাহাতে আর কোনোই সন্দেহ নাই। খোদার সেবায় দাসত্ব নাই, তাহাতে আত্মার ও মনের সজীবতা নষ্ট হয় না কিন্তু প্রাণহীন পৌত্তলিকতার প্রভাবে আজ এই বিরাট মুসলিম সমাজ আত্ম-জ্ঞান বিহীন হইয়া পড়িতেছে। যে পৌত্তলিকতাকে হজরত মহম্মদ (আঃ) নিন্দা করিতেছেন, যে পৌত্তলিকতার প্রচারের ফলে মানুষ বহু দেবতার পূজক হইয়া সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব হারাইয়া বসে, যাহার ফলে আজ আমাদের হিন্দু-ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে নানারূপ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, আজ অলক্ষ্যে সেই মনোভাব ও আন্দোলন আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইতেছে। প্রবৃত্তি ও বাহ্যিক রীতি-নীতির যদি আমরা অতিশয় ভক্ত হইয়া পড়ি তবে আমাদিগকে প্রকৃতির নিয়ম বশতঃ বহুমতাবলম্বী হইতে হইবে এবং এই উদার মুস্‌লিম সমাজের ভিতর নানারূপ সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত মনোভাবের সৃষ্টি হইবে। এক আল্লার উপাসক না হইয়া তখন আমরা নানারূপ রুচির পূজা করিতে থাকিব। এমনই করিয়া ভেদের সৃষ্টি হওয়াতেই মানবজাতি একই পরম পিতার

সন্তান হইলেও তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃ ভাবের অবসান হয় এবং তাহারা একে অন্যকে হিংসা করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। যে গৃহে হজরত ইব্রাহিম এক খোদার উপাসনা করিয়াছিলেন সেই গৃহেই রসুল দেখিতে পাইলেন যে ৩৬০টী প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ এক একটী মূর্ত্তি যে এক এক ব্যক্তির বা এক এক সম্প্রদায়ের আদর্শ ও প্রবৃত্তির মানস-মূর্ত্তি তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভেদ ব্যবধানের তাণ্ডব-লীলা দর্শনে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন এবং হিংসা দ্বেষ পূর্ণ ও পশু ভাবাপন্ন মানব-ভ্রাতাগণকে উদ্ধার করিবার জন্য ৪০ বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে যে শান্তিময় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ইসলাম—এবং সেই শুভ মুহূর্ত্তে কোরাণে যে পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা এই—"তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু, আল্লাহ্, তোমাদের প্রাণে প্রীতিদান করিলেন এবং সেই জন্যই ভ্রাতৃভাবের পবিত্র আশ্বাস প্রাপ্ত হইলে।"

আজ যদি আমরা মুসলমান সমাজের দিকে লক্ষ্য করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে রসুলের কার্য্যের পূর্ব্বে আরব সমাজে বিভিন্ন আদর্শের ও বিকৃত রুচির অনুবর্ত্তিতা হেতু যেরূপ মতভেদ ও নানারূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছিল বর্ত্তমানে সেইরূপ অবস্থার সূচনা হইতেছে। মনুষ্য-সমাজে একের জন্য অন্যের সমবেদনা নাই, স্বার্থত্যাগ স্বপ্ন-কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে; ইসলামের পবিত্র আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়া ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ও আত্ম কলহের দ্বারা আমরা খোদাতায়ালার দান জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তির অপব্যবহার ও অপচয় করিতেছি। মানব-সেবায় ও শান্তি স্থাপনে আত্ম নিয়োগ না করিয়া মুসলমানগণ হিংসাদ্বেষের অগ্নি-সংযোগে নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এত বড় একটা মুসলিম সমাজ প্রাণহীন কাঠামের বা সাধনা বিহীন বাহ্যিক আচারের সেবক হইয়া আত্মোন্নতি না করিয়া আত্ম হত্যার অভিনয় করিতেছে এবং বিশ্ব প্রতিপালক "রব্বুল আলামীনের" কার্য্যে বাধা জন্মাইতেছে। বহু মত প্রচারের ফলে আমরা সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পথ খুঁজিয়া সত্যের সন্ধান পাইতেছি না। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারাই এই সকল সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সত্য ধর্ম্মের পুণ্য প্রতিভায় আত্ম নিবেদন করিতে সক্ষম হন। মানব-সমাজের মুক্তি-বিধাতা মহা-পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মানুষের উদ্ধারের জন্য সরল সহজ ও সত্য পথেরই সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। আজ যদি আমরা মনোবলে বলীয়ান হইয়া উঠিতে পারি, তবে যে সকল তথা কথিত আধুনিক ধর্ম্ম-নেতাগণ আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া আমাদিগকে বিপথে টানিতেছেন; তাঁহাদের হস্ত হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা পাইব। ভ্রাতৃ-ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া যথার্থ শান্তির ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য রসুল উপদেশ দিয়াছেন—"হোব্বুল অতানে মিনাল ঈমান' অর্থাৎ স্বদেশ-প্রেমই আল্লার প্রতি বিশ্বাসের যথার্থ নিদর্শন। তাহা হইলে এই সকল নায়েবগণের তথা কথিত নির্দ্দেশিত মতগুলি উপেক্ষা করিয়াও আমরা প্রকৃত মুক্তি ও শান্তি পাইতে পারি। মহা কবি হাফেজ একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন :—

৬—

جنگ هفتاد و ملت همه دا عذر بنه + چون لا ندند حقیقت داه افسانه زدند

The disputes of the *72* sects put them all aside.

As they did not see the truth they worked to fiction."

তবে এখন আমাদের স্বদেশ কি তাহা চিনিতে হইবে। দেশ-প্রেম বলিতে কৃষি-প্রধান দেশে কৃষকের সেবা ও তাহাদের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সাধনই সর্ব্ব-প্রথম বুঝায়। কৃষকরাই এ-দেশের প্রকৃত অধিবাসী, তাহারাই এ-দেশের মেরুদণ্ড, তাহাদিগের দুঃখে আমাদের যথেষ্ট সমবেদনা আছে—ইত্যাদি বহু বড় বড় কথা প্রতি নিয়তই আমরা অনেক অভিনেতার মুখে শুনিয়া থাকি। কিন্তু এই সকল নেতাদিগের মানুষ মাতান' বাক্যে আন্তরিকতা কতদূর আছে তাহা বলা কঠিন। তাঁহাদিগের কার্য্যে সাধনা নাই, ত্যাগ নাই, আত্মোৎসর্গ নাই। যাহাদের কথা ও কার্য্যে সামঞ্জস্য নাই তাঁহাদের বুঝি সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার প্রতিও কোন শ্রদ্ধা নাই। যদি আমরা প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তি হই, যদি খোদা ও রসুলের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে তবে এই কৃষককুলের উন্নতি-সাধনকেই দেশ-সেবার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়া মনে করা উচিত। যদি আমরা এই বিরাট দরিদ্র কৃষক সমাজের উপকার করিতে পারি তবে যথার্থই স্বদেশেরও উপকার করিতে পারিব এবং ইহাতেই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মানুশীলন হইবে।

এই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশের জল বায়ুতে মাতৃদেহের ক্ষীর-ধারার ন্যায়ই আমাদের প্রকৃতি গত অধিকার আছে। এদেশকে ভালবাসিতে সকলের ন্যায় আমাদেরও অধিকার আছে। এদেশের স্বরূপ অবগত হইয়া প্রধানতঃ কৃষকের সেবাই আমাদের প্রকৃত স্বদেশ-সেবা বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্তু ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে যেমন রোগ নির্ণয় প্রয়োজন পথ্য নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যেমন রোগীর শারীরিক অবস্থা জানা দরকার, দেশ-সেবায়ও সেইরূপ ভাবে ধর্ম্ম-পন্থা নির্দ্দেশ করা একান্ত আবশ্যক। সমবায় কর্ম্মীগণ বহু ভাবে কৃষক সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া তাদের অবস্থা এবং কি ভাবে কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইলে এই অবস্থার অপনোদন হইতে পারে, তাহা হইতেই সহজেই বুঝিতে পারেন। কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, গো-মড়ক দেশে লাগিয়াই থাকে; অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে দেশ আচ্ছন্ন, দারিদ্র্যের তীব্র দংশন কৃষকগণকে দিনে দিনে পলে পলে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। অভাবের তাড়নায় স্বভাব বিকৃত হইয়াছে। আল্লার পবিত্র দান—জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছে না। এই ধ্বংস-লীলার অবসান হওয়া একমাত্র সমবায় আন্দোলনের উপরই নির্ভর করে। একমাত্র দেশে সমবায় সমিতি স্থাপন দ্বারাই অন্ন, বস্ত্র, সুখ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির সাধন সম্ভবপর।

সুদের কথার অবতারণা করিয়া, সমবায় ঋণদান সমিতি সুদের কারবার করে বলিয়া যাঁহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে দুই একটি কথা বলিতে চাই। তাঁহারা এইরূপ

ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিরক্ষর মুসলমানকে সমবায় আন্দোলনের ধারেও আসিতে দিতে চান না। এটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি। আমার মনে হয় সমবায় ঋণদান সমিতির অর্জ্জিত লাভকে আমরা সুদ না বলিলেও পারি। কারণ যে অতিরিক্ত টাকা লাভ বাবদে দেওয়া হইয়া থাকে তাহা তাহাদের সকলের সম্মতি ক্রমে এবং সকলের হিতের জন্য সাধারণ তহবিলে জমা হইয়া থাকে। এই টাকা কাহাকেও নিষ্পেষিত করিয়া লওয়া হয় না। দাতা এবং গ্রহিতা সমভাবাপন্ন হইয়া কার্য্য করেন এবং তাঁহারা একই ব্যক্তি। অন্য কোন ব্যক্তি বাহির হইতে ঐ টাকার লাভ লইতে আসে না। যেখানে সুদ আছে সেখানে দাতা ও গ্রহীতা ভিন্ন ব্যক্তি। যেখানে গ্রহীতা সুদের জের টানিতে টানিতেই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যায় সেইখানেই সুদের কথা বলা চলে। যদি জাকাতের পয়সা নরকের ভয় দেখাইয়া লইবার নিয়ম আমাদের 'নায়েবে রসুল সাহেবেরা' করিতে পারেন এবং যদি জেহাদের পর লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সাধারণের হিতের জন্য, সেবার জন্য সঞ্চিত হইতে পারে; তবে সর্ব্ব-সাধারণের হিতের জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন দ্বারা দেশ-সেবা করিয়া খোদার উপযুক্ত বান্দার কার্য্য কেন যে করা যাইবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। কেন যে ইহাও কোরাণের আদিষ্ট "আমলে ছালেহার" অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে না তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

অনেকেই হয়ত বলিবেন যাহা আলেমগণ বলিয়াছে তাহাই করিতে হইবে; কিন্তু আমি আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে তাঁহারা কোন স্বার্থপর এবং অহমিকাপূর্ণ লোকদিগের কথায় আস্থা স্থাপন না করিয়া, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং শয়তানের প্ররোচণা মন হইতে বিদূরিত করেন; কেন না "কুনকেন মোমেনীন আব-সোল্লাহু"। সংশয়স্থলে চিত্তস্থির করিয়া বিবেকের আদেশ মানিয়াই চলিতে হইবে, অন্য কোথায়ও হইতে আমদানী বুদ্ধি শয়তানের প্রেরিত জিনিষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। কোরাণের ইহাই আদেশ "Follow not that of which you have no knowledge. Surely the hearing, the sight and the heart, all of these shall be guided about that purpose."

অতএব আশা করি উপরোক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া আপনারা সমবায়কে কোরাণের অনুশাসন বলিয়াই মনে করিবেন। ইসলাম-অনুমোদিত পবিত্র শান্তি ও সার্ব্ব-জনীন ভ্রাতৃ-ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সমবায়কেই একটি শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া মনে করিবেন। এ আন্দোলনে যোগদান করিলে আত্মা ও মন পবিত্র হইবে এবং প্রকৃত দেশসেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়া "সেরাতুল মোস্তাকিমের" দিকে চলিতে পারিবেন।

মোগল-যুগে চিত্র-চর্চ্চা

—আব্‌দুস সালাম

মুসলমান শাস্ত্রে চিত্র ও ভাস্কর শিল্প চর্চ্চা নিষিদ্ধ হইয়াছে কারণ উভয়ই পৌত্তলিকতা ও ঈশ্বরত্ব দাবী করার পক্ষে সহায়—'divinity presumption' এর পরিপুষ্টি সাধন করে। শাস্ত্রের বিধানানুসারে শিল্পী ও শিল্পানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই নরকে যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া লয়। ইসলাম ধর্ম্ম প্রথম প্রচারের দিনে ঘোর পৌত্তলিকতা-পূর্ণ আরব দেশে এই নিষেধ বাণী ঘোষণা করা হইয়াছিল। জগতে শান্তি স্থাপনের পর মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির ক্রমঃবিকাশের সঙ্গে তখনকার এই বিধির সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কালে কালে যুগে যুগে মানব চিত্তের অদম্য উৎসাহ ও মানবাত্মার আকুল আবেদন শাস্ত্রের বাধা অতিক্রম করিয়া চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পে পূর্ণ প্রকাশ পাইল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাগ্‌দাদ সহরে যখন ইসলাম ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিভা বিরাজমান ছিল তখনও আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ ইস্‌লামের রক্ষক ও পরিপোষক হইয়াও চিত্র-চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাহাদের আদেশে রাজ-দরবারে আলবাম তৈয়ার করা হইয়াছিল। শাস্ত্রের জয় হইয়াছিল ভাস্কর্য্যের দিক্‌ দিয়া। সব সময় সব জাতির মুসলমান অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভাস্কর শিল্প হইতে দূরে রহিয়াছিল কিন্তু চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পে মুসলমান উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতে বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞানে মহীয়ান শক্তিমান মুসলমান সম্রাটগণই প্রথম শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিলেন, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ, নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইলেন। ধর্ম্ম আর মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি উভয়কেই একত্র যুক্ত করিলেন। কলা ও শাস্ত্র যে পরস্পর বিরোধী নহে, ধর্ম্ম ও আর্ট যে বিভিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয় না, ইহাই তাঁহারা বুঝাইয়া দিলেন। খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমরখন্দ ও হিরাটে যে শিল্পের চর্চ্চা হইয়াছিল ও খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পারস্য দেশের তৈমুর বংশীয় সম্রাটদের উৎসাহে যে শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, ভারতীয় মোগল সম্রাটগণ সেই চিত্র-শিল্পের বীজ ভারতে বপন করিয়াছিলেন। ভারতীয় আবহাওয়ায় তাহা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া উত্তর কালে মোগল-চিত্র জগতের সমক্ষে একটা বিস্ময়কর ও আদরণীয় জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মোগল সম্রাটগণ কেবল বিলাসপ্রিয় ছিলেন না, তাহারা গুণের আদর করিতে জানিতেন, জগতে যাহা সত্য সুন্দর ও প্রশংসনীয় তাহা তাঁহারা সহজেই গ্রহণ করিতে পারিতেন। শৌর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে তাঁহারা অতুলনীয় ছিলেন, তাঁহাদের যুদ্ধ-কৌশল, সুনিপুণ অস্ত্র চালনা, তাঁহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য তখনকার যুগের সব জাতিকেই চমৎকৃত করিয়াছিল কিন্তু মোগলদের ইতিহাস শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস নহে, শুধু জয় পরাজয়ের ইতিহাস নহে। জগতের সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহারা যে সব অমূল্য অনুষ্ঠান,

কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আবহমান কাল পর্য্যন্ত জগতের আদর্শ হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের চেয়ে বিস্ময়কর ছিল তাঁহাদের আইন কানুন, শাসন পদ্ধতি, জ্ঞান গরিমা ও সর্ব্বোপরি তাঁহাদের শিল্প নিদর্শন। প্রাচ্যের রাফেয়েল বলিয়া সুবিখ্যাত কামালদিন বিহজাদ ও মিরাক নামক বিখ্যাত চিত্রকরেরা পারস্য দেশে যে চিত্র শিল্পের চর্চ্চা করিয়াছিলেন সম্রাট আকবরের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদেরই অনুকরণে প্রথম চিত্র শিল্প চর্চ্চা হইত। মোগল চিত্র-শিল্প প্রথম পারস্য চিত্র-শিল্পেরই শাখা ছিল। আকবরের দরবারে যে সমস্ত বিদেশী চিত্রকর ছিলেন পারস্য চিত্র শিল্প হইতেই তাঁহারা প্রথম প্রেরণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সম্রাট যখন ভারতীয় শিল্পীগণকে রাজচিত্রকর বলিয়া গণ্য করিয়া লইলেন তখন ভারতীয় শিল্পীগণের হাতে পড়িয়া পারস্য শিল্প অন্যরূপ আকার ধারণ করিল। Persian influence ক্রমেই লোপ পাইল। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ও মোগল চিত্র শিল্পের ধারা, ও ইহার ক্রমবিকাশ, technicalities ও branches এর আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই বিষয় আর একটি বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনার যোগ্য। তবে শাস্ত্রের নিষেধকে মোগল সম্রাটগণ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উদ্দীপনায় ও অনুপ্রেরণায় নিষিদ্ধ চিত্র শিল্পের কি রকম চর্চ্চা হইয়াছিল তাহার আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্রাট আকবর ইসলাম ধর্ম্ম হইতে ক্ষণ কালের জন্য বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বোধ হয় এই ধারণা হইতে পারে যে, তাঁহার রাজত্ব কাল হইতেই প্রথম চিত্র চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু তাহা সত্য নহে। সম্রাট বাবর সুন্নী মুসলমান ছিলেন এবং রীতিমত নামাজাদি আদায় করিতেন কিন্তু তাহার যথেষ্ট সৌন্দর্য্য-লিপ্সা ছিল। তিনি একাধারে সুকবি শক্তিশালী লেখক ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তবে তাহার জীবনটা অনন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের জীবন ছিল তাই তিনি তেমন ভাবে শিল্প চর্চ্চা করিতে পারেন নাই। তিনি যে চিত্র শিল্পের একজন সূক্ষ্ম সমালোচক ছিলেন তাহা বিখ্যাত tihzad সম্বন্ধে তিনি তাঁহার আত্ম জীবনীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই তাহার প্রমাণ।* তিনি লিখিয়াছেন Bihzad এর চিত্র খুবই সুন্দর কিন্তু তিনি শ্মশ্রুবিহীন চেহারা ভাল আঁকিতে পারিতেন না, কিন্তু সব সময়ই যুগ্ম চিবুক (Double chin) দীর্ঘ করিয়া আঁকিতেন, কিন্তু শ্মশ্রুপূর্ণ চেহারা নিপুণতার সহিত অঙ্কন করিতে পারিতেন।

সম্রাট বাবরের তত্ত্বাবধানে অনেক চিত্রকর কাজ করিতেন। আলোয়ারে সংরক্ষিত হস্তলিখিত তাঁহার আত্মজীবনীর পার্শী অনুবাদ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। মাননীয় R. B. William প্রণীত An Empire builder in the 16th Century নামক বহিতে তাহার ৭ খানি ছবি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

* His work was very dainty but he did not draw beardless faces well. He used regatly to lengthen the double chin, bearded faces he drew admirably.

হুমায়ুন বাদশাহের রাজত্ব কালে চিত্র শিল্পের বিশেষ চর্চ্চা হয় নাই। বাদশাহের আত্মজীবন খুবই অশান্তিপূর্ণ ছিল। ভ্রাতৃবিরোধ ও শের শাহের দৌরাত্ম্যে রাজ্যচ্যুত হইয়া তিনি বৎসরাধিক কাল পারস্য সম্রাট Shah Jahmasp এর রাজ অতিথি ছিলেন। বিনিয়ন আর্নল্ড্ সাহেব লিখিয়াছেন যে ভারতে মুসলমান চিত্র-শিল্প চর্চ্চার পক্ষে হুমায়ুনের পারস্য অবস্থান বোধ হয় কিছু সহায়ই হইয়াছিল। চিত্রক র আবদুস সামাদ হুমায়ুন বাদশাহের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি এই শিল্পকে যথেষ্ট আদর করিতেন কিন্তু তাহার সময়ের চিত্র তেমন ভাবে চর্চ্চা হয় নাই। সম্রাট আকবরের দরবারে চিত্র-শিল্প চর্চ্চার পূর্ব্বেও কোন কোন স্থানে যে সমস্ত মোগল style এর চিত্র পাওয়া যায় তন্মধ্যে South kensington এর Victoria and Albert Museum এর ভারতীয় বিভাগের সংরক্ষিত সুতার উপর কাজ করা ২৪ খানি বড় চিত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ছবিগুলি কাশ্মীর প্রদেশে অঙ্কিত করা হইয়াছিল। তখন কাশ্মীর-প্রসিদ্ধ 'তারিখে রসিদী'প্রণেতা হায়দর মির্জ্জা Doglat এর অধীনে ছিল। হায়দর মির্জ্জার আদেশে ও উৎসাহেই বোধ হয় চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। বাদশাহ আকবরই প্রথম চিত্র-শিল্পকে রাজকীয় বিভাগে স্থান দেন। সাধারণের বিশ্বাস এই—আকবর বাদশাহের ইসলাম ধর্ম্ম ও বিধি নিষেধের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও আস্থা ছিল না বলিয়াই তিনি ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার "দিনী ইলাহি" প্রচারের সঙ্গে ২ তিনি মুসলমান ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া অনেক ইসলাম-ধর্ম্ম গর্হিত নীতি প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই, প্রায় পনর শত সত্তর সাল হইতে তাঁহার দরবারে পূর্ণোদ্যমে চিত্র চর্চ্চা চলিতেছিল, রাজকীয় ঐতিহাসিক আবুল-ফজল এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন "সম্রাট আকবর যৌবনের উন্মেষ হইতেই চিত্র- শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, চিত্র-শিল্পকে একাধারে আনন্দ দায়ক ও জ্ঞান-উন্মেষক মনে করিয়া তিনি এই শিল্পচর্চ্চায় সর্ব্ব প্রকার উৎসাহ প্রদান করিতেন।" তখন তিনি একজন ধর্ম্মভীরু মুসলমান ছিলেন কিন্তু তিনি "আদেশের নিগ্রহ" সহ্য করিতে পারিতেন না, প্রকৃতিতে যাহা সুন্দর, যাহা মনোরম ও চিত্তাকর্ষক তাহা তিনি সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিতেন। "দিনী এলাহি" প্রচার ও ইসলাম ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবার সঙ্গে তাহার এই স্বভাবের কোন সম্পর্ক ছিল না। চিত্র-চর্চ্চা তাহার শৈশবের একটা নেশা ছিল, তাই তিনি লেখা পড়ার দিকে মনোযোগ না দিয়া ড্রইং এবং পেইন্টিংএর দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে ২: তাঁহার যৌবনের প্রথম দীক্ষা—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-লিপ্সা ও শিল্পানুরাগ ক্রমঃ বিকাশ পাইতে লাগিল, এবং উত্তরকালে তাহা পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল। বিনিয়ন আর্নল্ড্ সাহেব তাঁহার Court Painters of the great Moguls নামক অমূল্য গ্রন্থে আকবর বাদশাহের চিত্রানুরাগের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁহার স্বভাবগত ধর্ম্ম ছিল।* সম্রাট আকবর ও তাঁহার বিখ্যাত বংশধরগণের যেমন এই সৌন্দর্য্য-লিপ্সা মজ্জাগত ছিল, সম্রাট আকবরের ও তেমনি মজ্জাগত ছিল। এবং বিশ্বের এই সৌন্দর্য্য লিপ্সা ক্রমে একটা ধর্ম্মভাবে পরিণত হইয়া চিত্র-শিল্পে তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠে চিত্র শিল্পকে আকবর source of knowledge জ্ঞানের উৎস বলিয়া জ্ঞান করিতেন, শাস্ত্রে নিষেধবাণী তিনি অন্ধের ন্যায় মানিয়া চলিতেন না, বুদ্ধি বিবেচনার কষ্টি পাথরে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লইতেন, শাস্ত্রীয় বচনের অক্ষরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিতেন। তাঁহার অসাধারণ যুক্তি ও তর্কের নিকট শাস্ত্র প্রচারকেরা হারিয়া যাইতেন। শাস্ত্রকার মনে করেন—চিত্রাঙ্কণ করিলে গুণা হয় কারণ মানুষ বিশ্ব-স্রষ্টার কাজে হস্তক্ষেপ করে, ঈশ্বরত্ব দাবী করিতে প্রয়াস পায়। সম্রাট আকবর প্রায়ই বলিতেন, "It appears to me as if a painter has quite peculiar means of recognising God for a painter in skectching anything that has life and in devising its limbs one after another must come to feel that he can not bestow personality upon his work and is thus forced to think of God—the Giver of life and will thus increase in knowledge" অর্থাৎ—আমার মনে হয় চিত্রকরের খোদাকে চিনিবার এক বিশিষ্ট উপায় আছে। চিত্রকর যখন একটী প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করে এবং একটীর পর একটী করিয়া সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অঙ্কন শেষ করে কিন্তু অবশেষে প্রাণ দিতে সক্ষম হয় না তখন স্বতঃই জীবনের সৃষ্টিকর্ত্তার কথা তাহার মনে উদয় হয়। এইভাবে তাহার জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়। অতএব চিত্রর চর্চ্চার চিত্রকরের মনে ঐশ্বরিকতার স্পর্দ্ধা আনয়ন করা দূরে থাকুক ঐশ্বরিক শক্তির নিকট মানব শক্তি যে কত ক্ষুদ্র কত নগণ্য তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া চিত্রকরের হৃদয় প্রগাঢ় ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া তুলে।

সম্রাট আকবরের যুক্তির উপর আমাদের আর কিছুই বলিবার থাকে না। ধর্ম্ম যদি সাধারণ জ্ঞানের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, ধর্ম্মের নীতি অনুষ্ঠানগুলি যদি সহজ বুদ্ধি বিবেচনার বাহিরে না হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে আকবরের যুক্তির ভিতরে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। যদি কাফের হইবার ভয় মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া আকবরের যুক্তিটা একবার বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে তাঁহার যুক্তির সত্যতা সহজে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

---

* A vibid sensibility to natural beauty was indeed part of his nature. It was in his blood as it was in the blood of Babar & others of his brilliant race. And it was through this intense feeling for the wonder & giory of the world, reaching out into a sentiment of religiou ·adoration that Akbor came to an appreo'ation of the art.

সম্রাট আকবরের চিত্র শিল্পের প্রতি কতটুকু যত্ন ছিল তাহা তাঁহার বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিত আইন-ই-আকবরিতে বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্রাটের চিত্র শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও শিল্পীদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখিয়া সমরকান্দ, বোখারা প্রভৃতি দূর দেশ হইতে শিল্পীগণ আসিয়া তাঁহার দরবারে সমবেত হইলেন। এদিকে ভারতের নিজস্ব শিল্পীগণ যাঁহারা হিন্দু রাজত্বের অবসান কাল হইতে একরূপ মরিয়া হইয়া রহিয়াছিলেন বাদশাহের অনুগ্রহে তাঁহারাও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন—পুনরায় তুলি হাতে লইলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই তুলি শিল্পে পারদর্শিতা দেখাইয়া সম্রাটের বিশেষ আদরণীয় হইয়া উঠিলেন। সম্রাট জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে মোটা মাহিয়ানা দিতেন ও যথেষ্ট সম্মান করিতেন। বিখ্যাত চিত্রকরগণকে তিনি মনছবদার শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেন। সহকারী কার্য্যকর ও দপ্তরীদিগকে তিনি তখনকার দিনের মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিয়ানা দিয়া আহাদি শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেন। এই মাহিয়ানা হইতেই তাহাদের ভরণপোষণ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। তাঁহার এই বিরাট শিল্প নিকেতনে যত শিল্প অঙ্কিত হইত সম্রাট তাহা সপ্তাহে একবার করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতেন ও কার্য্যের নৈপুণ্য অনুসারে চিত্রকরকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া মাসিক বেতনের হার বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিয়াছেন "এই সব কারণেই চিত্র শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। চিত্রকরের প্রয়োজনীয় জিনিষাদিরও অনেক উন্নতি হইয়াছিল। প্রত্যেক চিত্রের উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করা হইত। বিশেষ করিয়া বর্ণ সংমিশ্রণ কৌশল যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বিহিজাতের অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় সুনিপুণ চিত্র অঙ্কিত হইতে লাগিল। প্রায় শতাধিক চিত্রকর চিত্র শিল্পে দক্ষতা লাভ করিলেন; মধ্যম রকমের চিত্রকরের সংখ্যাও কম ছিল না।

সম্রাট আকবর আগ্রা, দিল্লী ও অন্যান্য নগরগুলিতে রাজ পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এসিয়ার সাহিত্য ভাণ্ডারে যত অমূল্য গ্রন্থরাজি ছিল তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া চিত্রে পরিশোভিত করিয়াছিলেন। আমির হামজার গল্প বইখানাতে প্রায় ১৪০০ চিত্র সংযুক্ত করা হইয়াছিল। মহাভারতের অনুবাদ, রজম নামা প্রণয়ণ ও চিত্রাঙ্কন করাইতে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। রজম নামা এখন জয়পুর যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। Cornal Hanna সাহেব বলেন তাঁহার নিকট রামায়ণের যে অনুবাদ আছে তাহা প্রস্তুত ও চিত্রাঙ্কন করাইতে তাঁহার তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই রামায়ণখানা বর্ত্তমানে Washington এ আছে। আকবর-নামার গল্পগুলিতেও তেমনি চিত্রাঙ্কন করা হইয়াছিল। আকবর নামার ১১৭ খানা ছবি এখন South Kensington এ সংরক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত চেঙ্গীস-নামা Jafar nama, নলদময়ন্তী, কালিলা দামনা, আয়ারদানিস, নিজামি, ওয়াকিয়াতে বাবরি ইত্যাদি গ্রন্থগুলির গল্প চিত্রে শোভিত করা হইয়াছিল। স্পেন দেশীয় পাদ্রী Sebestean Manrik ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে ছিলেন; তাঁহার মতে রাজ পুস্তকালয়ে তখন ২৪০০০ খণ্ড পুস্তক ছিল।

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য গড়ে ২৭০৲ টাকা নিরূপণ করা হইয়াছিল। বাইবেলের গল্প হইতেও সম্রাট আকবর ছবি অঙ্কন করিয়া তাঁহার দরবার পরিশোভিত করিয়াছিলেন।

আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহাজাহান, আওরংজেব এই পুস্তকালয়ে আরও অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজকীয় পুস্তাকাগার সমূহ বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। বাদশাহ্‌দিগের অনুকরণে রেহিলাধিপতি ও অযোধ্যার নবাবের ন্যায় অধীনস্থ নবাবগণ যে ছোট ছোট পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাও ঐরূপ বিপ্লবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ হইতে যে সব ছবি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই সাধারণ যাদুঘরে ও ব্যক্তি বিশেষের নিকটে সংরক্ষিত আছে।

Manuscript চিত্রাঙ্কন ছাড়া সম্রাট আকবর দেওয়াল গাত্রে চিত্রাঙ্কন বা Fresco painting এর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। Fresco painting গুলি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আকবর বাদশাহ্‌ ফতেপুর সিক্রিতে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন সেখানে তাঁহার খাবগাহ এবং মারিয়ম বিবির প্রাসাদ গাত্রে তাহার শেষ চিহ্ন দেখা যায়। E. W. Smith সাহেব তাহার Mugal architecture ও ফতেপুর সিক্রি নামক বইতে সে সব প্রকাশ করিয়াছেন। ফতেপুর সিক্রিতে সেই সব চিত্রের শোচনীয় ধংসাবশেষ স্বচক্ষে দেখিয়া মন বিস্ময়ে ও বিষাদে বড়ই অভিভূত হইয়াছিল।

সম্রাট আকবর portrait painting (প্রতিকৃতি-অঙ্কন) খুব পছন্দ করিতেন। আবুল ফজল লিখিয়াছেন "His Majesty sat for his own likness and took the portrait of his grandees." সম্রাট তাঁহার নিজের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করাইয়াছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজ্যের বড় বড় আমির ওমরাহগণের প্রতিছবি অঙ্কন করাইয়াছিলেন। এই সব Portrait প্রতিকৃতি গুলির দ্বারা অতি সুন্দর বাঁধান Album তৈয়ারি করা হইয়াছিল। বাদশাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অধীনস্থ আমির ওমরাহগণও তাঁহাদের নিজের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করাইয়াছিলেন। আকবর বাদশাহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের অধীনে যে সমস্ত শিল্পী কাজ করিতেন তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করা সুকঠিন। কারণ অনেক চিত্রে চিত্রকরের নাম ছিল ও অনেক গুলিতে নাম ছিল না। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরিতে সে যুগের বিখ্যাত চিত্রকরের (Master Artists) নাম লিখিয়া গিয়াছেন। সে যুগের চিত্র অনুসন্ধান করিলে প্রায় ২০০ চিত্রকরের নাম পাওয়া যায়; তবে আইন-ই-আকবরিতে কেবল ১৭ জন চিত্রকরের নাম আছে। ৲

১। মির সৈয়দ আলি [তিনি তাব্রিজ শহর নিবাসী। তিনি আমির হামজার গল্পগুলি চিত্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন।]

২। খাজা আব্দুস সামাদ [পারস্য দেশের সিরাজ শহরের অধিবাসী। Calligraphy or Painting এ তাঁহার পারদর্শিতার জন্য তাঁহাকে শিরিঁকলম বলিয়া অভিহিত করা হইত।

৭—

তিনি হুমায়ুন বাদশাহের পরম বন্ধু ছিলেন এবং আকবার বাদশাহের দরবারে আসার পূর্ব্ব হইতেই চিত্রকর ও কবি বলিয়া সুবিখ্যাত ছিলেন। আকবর বাদশাহ্ তাঁহাকে প্রথম ফতেপুর সিক্রি নগরীর Master of the Mint বা পরে মুলতান শহরের দেওয়ান বা Revenue commissioner পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।]

৩। ফররোখ [তাঁহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকবর-নামার clerk manuscript এ তাঁহার অঙ্কিত খুব সুন্দর কয়েকখানি চিত্র আছে।]

৪। মিস্কিন।

৫। দশোবন্ত [দশোবন্ত গরীবের ছেলে ছিলেন। জাতিতে কাহার বা পাল্কী বাহক হইলেও চিত্র শিল্পে অর্থ উপার্জ্জন ও সম্মান লাভের সহজ উপায় দেখিয়া শিল্প-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি তুলি-নৈপুণ্যে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। গরীব ঘরের এই রত্নকে আকবর বাদশাহ্ কুড়াইয়া লইয়া খাজা আবদুস সামাদের হাতে অর্পণ করিলেন:—"One day writes the courtly historian, the eyes of his majesty fell on him and himself handed over to the Khaja". অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহার সমসাময়িক চিত্রকরগণ তাঁহার প্রতিভার কাছে ম্লান হইয়া গেলেন। তিনি সে যুগের প্রথম ওস্তাদ হইয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার একটুকু পাগলামি স্বভাব ছিল। তিনি আত্মহত্যা করিয়া নিজের জীবন সাঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত অনেক গুলি চিত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।]

৬। Basawana বা বসন্ত [তিনি দশোবন্তের প্রতি দ্বন্দী ছিলেন। Back ground-drawing, distribution of colours এবং Portraiture এ তাঁহার খুব হাত যশ ছিল। আবুল ফজল কোন কোন বিষয়ে তাঁহাকে দশোবন্তের উপরে স্থান দিয়াছিলেন।]

৭। Kesu ৮। লাল ৯। মুকুন্দ ১০। মধু ১১। জগন্নাথ ১২। মহেশ ১৩। খেমকরণ ১৪। তারা ১৫। ছানওয়ালা ১৬। হরিবন্স ১৭। রাম।—চিত্র হইতে আর একজন কেসুর নাম পাওয়া যায়, উভয় কেসুরই দশবন্তের মত জাতিতে পাল্কী বাহক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি ১৫৮৮ খৃঃ কতক গুলি খৃষ্টির ছবির অনুকরণ করিয়া বাদশাহকে উপহার দিয়াছিলেন। এই লিষ্ট হইতে বুঝা যায় যে সব চিত্রকরই নিম্ন বংশ জাত ছিলেন। সম্রাটই তাঁহাদের ললাটে জয়টীকা পরাইয়া দিয়াছিলেন। জগন্নাথের অঙ্কিত ময়ূর-যুগল সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তার জন্য যশঃলাভ করিয়াছিল।

এক দিকে অসীম মহিমাময় সম্রাট আকবর ও অন্যদিকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী সম্রাট শাহজাহান এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিত্ব বিশেষ ম্লান হইয়া রহিয়াছে বটে কিন্তু তিনিও তাঁহাদের চেয়ে কম গুণবান সম্রাট ছিলেন না। রাজ্যের শাসন ও প্রজাপালন জন্য তিনি যে সকল অনুষ্ঠান রাখিয়াছেন তাহাই তাহার জলন্ত প্রমাণ।

তাঁহার ধমনীতে তাঁহার প্রপিতামহ বাবর ও তাঁহার পিতা আকবরের রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল তাই তিনিও সৌন্দর্য্যের উপাসক হইয়াছিলেন।

সম্রাট আকবর চিত্র-চর্চ্চাকে একাধারে ভোগের সামগ্রী ও জ্ঞানের সোপান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর চিত্র শিল্পকে কেবল ভোগের জিনিষ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজের শিল্প লিপ্সাকে চরিতার্থ করিবার জন্য, সৃষ্টির সৌন্দর্য্য শুধু উপভোগ করিবার জন্য তিনি চিত্র চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। চিত্র শিল্পের প্রতি তাঁর কতটুকু উৎসাহ ছিল, প্রাণের টান ছিল ও শিল্পীদের প্রতি তার কতটুকু যত্ন ও সহানুভূতি ছিল তাহা তাঁর নিজের আত্মজীবনী ও তাঁহার দরবারের ইংরাজ রাজদূত Roe এর নিজ হস্ত লিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়। সম্রাট নিজে একজন সুদক্ষ Connoisseur (শিল্প সমালোচক) বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। এবং তাঁর এই আত্মম্ভরিতার যথেষ্ট সার্থকতা ছিল। তিনি তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীতে (Tuzuke Jahangir) লিখিয়াছেন—চিত্র আমার খুব সখের সামগ্রী। আমি চিত্রকে এমন সূক্ষ্ম ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি যে চিত্রকর জীবিতই হোক আর মৃতই হোক ছবি দেখিয়া আমি তাঁর নাম বলিয়া দিতে পারি। যদি একই প্রকারের portrait কয়েক জন চিত্রকর দ্বারা অঙ্কন করা হয় তাহা হইলেও আমি কোন্ চিত্র কাহার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। এবং যদি একটি portrait কয়েকজন শিল্পী দ্বারা অঙ্কন করা হইত তাহা হইলেও সেই একটি চিত্রের কে কোন্ অংশটি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা বলিয়া দিতে পারি। বস্তুতঃ আমি কে কপোলদেশ, এবং কে চক্ষের পলক অঙ্কন করিয়াছে কিম্বা প্রথম চিত্রকর কাজ শেষ করার পর অন্য কেহ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কিনা তাহাও আমি স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারি। *

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কিরূপ Critical power of observation (সূক্ষ্ম সমালোচনা-দৃষ্টি) ছিল তাহা উপরোক্ত কথাগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়। বাস্তবিক তিনি যে ভাবে পশু পক্ষী ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহার অসাধারণ চিত্র পরিচয়ের শক্তি ছিল।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের চিত্রকরেরা শিল্প বিষয়ে কতটুকু পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন রাজদূত Sir Thomas Roeই তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

---

* I am very fond of pictures and have such discrimination in judging them that I can tell the name of the artist whether living or dead. If there were similar portraits finished by several artists, I could point out the painter of each. Even if one portrait were finished by several painters, I could mention the names of those who had drawn the different portions of that single picture. In fact, I could declare without fail by whom the brow and by whom the eyelashes were drawn or if any one had touched up the portrait after it was drawn by the first painter.

Sir Thomas Roe তাঁর অমূল্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন "৬ই আগষ্ট তারিখে আমাকে দরবারে যাওয়ার জন্য ডাকা হইল। কারণ কোন একটি চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা। আমি কয়েক দিন পূর্ব্বে সেই চিত্রখানা সম্রাটকে উপহার স্বরূপ দিয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল ভারতবর্ষে আর কেহই সে চিত্রের অনুকরণ করিতে পারিবে না। আমি দরজায় আসিবা মাত্র বাদশাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজদূত যদি কোন চিত্রকর আপনার চিত্রের এমন একটি অনুকরণ করিয়া দিতে পারে যে আপনি আপনার নিজের চিত্র চিনিয়া লইতে না পারেন তাহা হইলে আপনি তাহাকে কি পারিতোষিক প্রদান করিবেন?" আমি উত্তর করিলাম—চিত্রকরের পুরস্কার ৫০৲। বাদশাহ উত্তর দিলেন "আমার চিত্রকর একজন cavalier—সম্ভ্রান্ত সামরিক কর্ম্মচারী, তাঁর জন্য ৫০৲ অতি তুচ্ছ। কতক্ষণ কথা কাটাকাটির পর সম্রাট আমাকে আর একদিন তাঁহার দরবারে অনুরোধ করিয়া সে দিনের মত বিদায় দিলেন। আর এক রাত্রে নিজের শিল্পীর কৃতকার্য্যতার জয়োল্লাস করিবার জন্য আমাকে ডাকিলেন। ছয়খানি চিত্র একখানি টেবিলের উপর ছড়ান হইল। ছবিখানি তাঁর নিজের চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কিত। সবগুলিরই এতটুকু সাদৃশ্য ছিল যে আশ্চর্য্যের বিষয় আলোকের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া চিত্র গুলিকে চিনিয়া লইতে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক খুবই কষ্টে আমি আমার চিত্রটাকে বাছিয়া লইলাম। কিন্তু আমি যে প্রথমেই আমার ছবিখানি চিনিতে পারি নাই দেখিয়া সম্রাট খুবই উৎফুল্ল ও হর্ষোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার শিল্পীর শিল্প চর্চ্চাকে ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা করিতে লাগিলাম।......আর একদিন বাদশাহ Sir Thomas Roe এর একটি বন্ধুর ছবি চাহিয়া তাহার অনুকরণ অঙ্কণ করিয়াছিলেন। Roe Sahib লিখিয়াছেন "In the art of limning his painters work miracles"

সম্রাট জাহাঙ্গীর খোদার সৃষ্ট জীব পশু পক্ষী গুলিকে খুবই ভাল বাসিতেন। জীবের প্রতি ভালবাসাটা তাঁর এত গভীর ছিল যে তিনি কোন নূতন ধরণের জীব দেখিলে রাজ চিত্রকর দ্বারা তাহার ছবি অঙ্কন করাইয়া রাখিতেন। আজ কাল Photographyতে যে কাজ করা হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের চিত্রকরেরা সে কাজ করিতেন।

সম্রাট লিখিয়াছেন "মকাব্বান খাঁ গোয়া হইতে আমার জন্য কতকগুলি মূল্যবান জিনিষ আনিল। সে সকল উপহারের জিনিষগুলির মধ্যে কতকগুলি পশু-পক্ষী দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে এ সকল পশু পক্ষী দেখি নাই। এবং কেহ তাহাদের নামও জানিত না।"—সম্রাট বাবর তাঁর আত্ম-জীবনীতে কতকগুলি জন্তুর বিশদ বিবরণ লিখিয়াছেন; কিন্তু আমার মনে হয় তিনি কোন চিত্র-করকে তাহাদের চিত্রাঙ্কন করিতে আদেশ করেন নাই। কিন্তু এই জন্তুগুলি অতি সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমি তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। এবং তাঁহাদের ছবি অঙ্কন করিয়া জাহাঙ্গীর-নামাতে সংযুক্ত করিয়া রাখিতে

আদেশ করিলাম। কারণ পাঠকগণের নিকট তাহাদের বিবরণ হইতে যথার্থ প্রতিকৃতিই অধিকতর আমোদ ও আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইবে।"

এইরূপ যখনই কোন নূতন ধরণের প্রাণী কিম্বা বৃক্ষ সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তখনই সে সৌন্দর্য্য স্থায়ী ভাবে উপভোগ করিবার জন্য তিনি সুনিপুণ শিল্পী দ্বারা তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কণ করাইয়া রাখিতেন। ইউরোপিয়ান ছবিগুলির মধ্যে যাহাই তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিত তাহাই তিনি ক্রয় করিয়া লইতেন ও ইহার অনুরূপ আরও কতকগুলি ছবি অঙ্কণ করাইয়া রাখিতেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও তাঁহার পিতার ন্যায় চিত্রকরদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং তাহাদের কৃতকার্য্যতায় তিনি নিজকে খুবই কৃতার্থ মনে করিতেন। তাঁহার দুর্গে কয়েকজন চিত্রকর বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। চিত্রকর যথা আবদুল হামিদের পুত্র শফিয়াখাঁকে তিনি Premier grandee র পদে (সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্ত অভিজাত খ্যাতিতে) ভূষিত করিয়াছিলেন। আবুল হাসান নামক আর একজন চিত্রকরের নাম উল্লেখ আছে। তাহার উপাধি ছিল নাদির-উজ্জমান। তিনি বাদশাহের দরবারের ছবি অঙ্কণ করিয়া বাদশাহকে উপহার স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। বাদশাহ তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাহার পদোন্নতি করিয়াছিলেন। মানছুর নামে আর একব্যক্তি চিত্রশিল্পে সে যুগের ওস্তাদ ছিলেন। তাহার উপাধি ছিল নাদিরুল আছলি। জাহাঙ্গীর বাদশাহ লিখিয়াছেন—Abul Hasan ও Mansur এর সমকক্ষ শিল্পী আর কেহই ছিল না।—কলিকাতা Art gallery তে Mansur এর অঙ্কিত খুব সুন্দর দুইখানা চিত্র আছে। একটী বাঙ্গালা দেশের পক্ষীর প্রতিচ্ছবি। আর একটী শ্বেত সারস পক্ষীর ছবি। সারস পক্ষীর চিত্রে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শিল্পীর তুলি নৈপুণ্যের পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল। এবং orinthological study হিসাবে ইহা জাপান দেশীয় বিখ্যাত ওস্তাদদের অঙ্কিত চিত্রের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছিল। *

জাহাঙ্গীরের আদেশানুসারে যে তুর্কী মোরগের ছবি আঁকা হইয়াছিল তাহাও মনছুরের তৈয়ারী। Havel সাহেব লিখিয়াছেন "No Chineese work could surpass the picture of the Turkey cock ordred specially by Jahangir and now in the Calcutta Art gallary.' তুর্কী মোরগের ছবিখানি দেখিবার জিনিষ। মনুচাহার বান্দা নামে আর একজন চিত্রকরের নাম পাওয়া যায়। যে সমস্ত Protract picture এ সম্রাটের নিজ হাতের সিল মারিয়া দিতেন, সে কার্য্যগুলি আর সব গুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল ও তুলি-নৈপুণ্যের চরম নিদর্শন ছিল। নানহা নামক আর এক চিত্রকরের অঙ্কিত সুরজমলের প্রতিচ্ছবি খানা খুবই সুন্দর হইয়াছিল।

*** As an orinthological study it rivals the work of the best Japanese masters.**

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল চিত্রচর্চ্চার চরম উৎকর্ষ লাভ হইয়াছিল। রাজ্যে পূর্ণ শান্তি বিরাজমান থাকায় তিনি স্থাপত্য ও শিল্পে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর অফুরন্ত ধন ভাণ্ডার ছিল। তাই তিনি শিল্পকে অগণিত অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন, ও নিজের ইচ্ছানুযায়ী চিত্র অঙ্কন করাইয়া লইতেন। সম্রাট কবি শাহজাহান কতটুকু সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন অতীতের গৌরবময়ী যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া বিশ্ব-বিশ্রুত তাজমহল তার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁর হৃদয়ের ভাব, মনের কোমল প্রবৃত্তি শিল্প-কলার প্রতি একটা গভীরতম শ্রদ্ধা ভক্তি, তাজমহলেই আত্ম প্রকাশ করিয়াছে।—স্থাপত্য-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিত্র-শিল্পের ও উন্নতি হইয়াছিল। ঐতিহাসিকের উক্তি যে Shah-Jahani reign marked the culmination of the Mughal civilisation.

সম্রাট শাহজাহানের আমলে অনেক . বিষয়ে চিত্রাঙ্কন করা হইয়াছিল। অনেক সময় এক চিত্রই অনেক চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত হইত। প্রত্যেক চিত্রকরের নাম ও তাহার অঙ্কিত ছবি সমূহের বিবরণ দেওয়া একটা দুরূহ ব্যাপার।

Br. museum এ সংরক্ষিত Album হইতে নিম্নলিখিত শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। তবে চিতরমণ বা কল্যাণ দাস একজন বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। অনুপছতর শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সুকোর চিত্রকর ছিলেন। মনোহর, সমরকন্দ মিবাসি মহম্মদ নাদির, মির হাসিম, ও মহম্মদ ফাকরোল্লা খাঁন, গোবর্দ্ধন, ভাগবতী এই সব চিত্রকরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Portrait painting (প্রতিকৃতি অঙ্কন) সম্রাট শাহজাহানের সময় খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। তন্মধ্যে Br museum এ সংরক্ষিত একখানা অতি মূল্যবান Album আছে। তাহাতে শাহজাহানের একজন কর্ম্মচারীর চিত্র, নাদির খাঁ কর্ত্তৃক আজম খাঁ কোকার চিত্র; আহদ খাঁর চিত্র, শাহজাহানের দরবারে ইত্যাদি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "শাহজাহানের দরবারে" ছবি খানার মূল্য ২০০৲।

সম্রাট শাহজাহানের সময় পশু-পক্ষী ইত্যাদির ও প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হইয়াছিল। তখনকার শিল্পীগণ পশু-পক্ষীর আচরণ বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিত তাই তাদের পশু পক্ষীর ছবিগুলি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইত। মনোহর শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত দারার প্রিয় অশ্ব দীল-পছন্দের ছবিখানা অতি সুন্দর। Johnson collection এ অনেক সুন্দর চিত্র সংরক্ষিত আছে।

এই সব প্রাণীর ছবি ভিন্ন আকবরের ন্যায় অনেক mss গল্পবাজ চিত্র দ্বারা পরিশোভিত করাইয়াছিলেন। মালওয়ার রাজা বাজ-বাহাদুর ও তাহার প্রণয়িণী কুমারী রূপ মতির গল্প খানার কয়েক প্রকারের চিত্র অঙ্কন করান হইয়াছিল। Calcutta Art gallery তে তাহার একটি সুন্দর নমুনা সংরক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত লায়লী মজনু, শিরি-খসরু (কামরান কামতা) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ Romantic গল্প গুলির চিত্রাঙ্কন করা হইয়াছিল।

অনেক শিল্পী মুসলমান ও হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের ছবি আঁকিতে খুব পছন্দ করিতেন। এই

ধরণের ছবির ভিতর দুইটি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয়টিই শাহজাহানের রাজত্ব কালের। তন্মধ্যে একখানা এক ফকিরের ছবি আর একখানা কোরাণ পাঠ রত এক মোল্লার ছবি। এই ছবিগুলি দারা সুকোর আলবামে সংরক্ষিত আছে।

এ যুগের আরও অনেক আলবামে খুব জাঁক-জমকশীল রাজদরবারের ছবি অঙ্কিত আছে।

Johnson collection এর ৯, ১০, ১১ volume গুলিতে কেবল স্ত্রীলোকের চিত্র দেখা যায়। কতগুলি স্নান করিবার ছবি। আর কতকগুলি Toilet এ ছবি। (vol II) ২য় ভাগে যে ছবিগুলি আছে তাহা অতি সুন্দর, তন্মধ্যে পারস্য পোষাকে পরিহিত (conical dress) এক রমণীর ছবিখানি অতি উৎকৃষ্ট ও মনোরম।

সম্রাট আরঙ্গজেব একজন অনুষ্ঠান প্রিয় মুসলমান ছিলেন। মুসলমানদের জন্য কোরাণ ও হাদিসে যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তিনি তাঁহার, দৈনন্দিন জীবনে সব গুলিই পালন করিতেন। মুসলমান ধর্ম্মে যাহা মকরূহ বা নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য তাহা কখনো তিনি নিজে করিতেন না ও তাঁহার রাজ্যে তাহার প্রশ্রয় দিতেন না। মুসলমান ধর্ম্মে সঙ্গীত চর্চ্চা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাই তিনিও তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রচলিত প্রথা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার দরবারে সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজ্যের মধ্যেও সঙ্গীত চর্চ্চা বন্ধ করিয়া তিনি একটি আইন জারী করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি চিত্র শিল্পের বিরুদ্ধে কোন আইন জারী করেন নাই কোন ঐতিহাসিক একথা স্বীকার করেন নাই। তবে তিনি স্বভাবতঃ এই শিল্পের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু বার্নিয়ার সাহেবের কথামত দেখা যায় তখনও রাজধানীতে State factory (চিত্র শিল্পাগার) ছিল। ক্রমে সম্রাটের পরিপোষকতা হারাইয়া বিচ্যুত হইয়া সেই সব শিল্পাগার factory ধ্বংস প্রাপ্ত হত শ্রী হইয়া পড়ে। দিল্লী নগরীতে আর যে সমস্ত বেসরকারী কারখানা ছিল সম্রাটের ও রাজধানীর আমীর ওমরাহগণের অনুৎসাহে সেগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

সম্রাটের অধীনে তখনও বিখ্যাত ওস্তাদ ছিল। P. Brown সাহেব বলেন আওরাঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে Deccan কলম নামে মোগল চিত্র-শিল্পের আর একটি শাখার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আওরঙ্গজেবের রাজদরবারে তখনও চিত্রকর বিদ্যমান ছিল। তাহাদের অনুপ্রেরণাই দাক্ষিণাত্যে মোগল চিত্র-চর্চ্চার শাখা স্থাপিত হইয়াছিল।

যাহা হউক বর্নিয়ার সাহেব বলিয়াছেন যে চিত্রকরেরা আর তেমন উৎসাহ পাইতেন না গুণের আর তেমন আদর ছিল না। চিত্রকে আর তত উচ্চে স্থান দিতেন না। বাদশাহের ঔদাস্যে আমীর ওমরাহ বহু মূল্যবান চিত্র কম মূল্যে বিক্রয় বা ক্রয় করাইতেন তাই বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্র চর্চ্চাতে আর তেমন প্রাণ ছিল না। বর্নিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন = Want of genius therefore, is not the reason why works of superior art are not

exhibited in the capital. If the artrists and manufacturers were encouraged, the useful and fine arts would flourish : but these unhappy men are combuned treated with hartness & inadequated remember for their labour. The rich will have every article at a cheap rate......The artist therefore who arrive at any eminence in their art are those only who are in the service of the king or of some powerful Omrah and who work exclusively for their patron.'

সুবিখ্যাত ও সুনিপুন চিত্রের লুপ্ত হওয়ার কারণ শুধু প্রতিভার অভাব নহে। শিল্পীগণকে উৎসাহ প্রদান করিলে হয়তঃ শিল্প চর্চ্চা উৎকর্ষ লাভ করিত। কিন্তু এই সমস্ত হতভাগাদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইত এবং পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করা হইত না। ধনী ব্যক্তিগণ সব জিনিষই অল্প মুল্যে খরিদ করিতে চাহিতেন। কাজেই যে সমস্ত শিল্পীগণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহাদের অনেকেই রাজ-দরবারে অথবা আমীর ও ওমরাহদের অধিনে চাকুরী করিতেন।

রাজকীয় উৎসাহ হইতে বঞ্চিত হইলেও চিত্রকরদের আগের মতই চিত্র চর্চ্চা চলিতে লাগিল। যুগের পর যুগ ধরিয়া (portrait paint) যে চিত্র শিল্পের চর্চ্চা হইতেছিল তাহা হঠাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। P. Brown সাহেবের মতে চিত্রের প্রাচুর্য্য পূর্ব্বের মতই রহিল কিন্তু নিপুণতা ও কমনীয়তা অনেক পরিমানে হ্রাস পাইল। এ যুগের চিত্রের মধ্যে প্রথমেই আওরাঙ্গজীবের নিজের প্রতিচ্ছবি আমাদের দৃষ্টি পথে আসে। Johnson collection এ সংরক্ষিত শিখ চিত্রকর ওস্তাদ Syon Chand এর অঙ্কিত Nawab gyslin khan এর ছবিখান খুবই সুন্দর। ইহার দাম ১১০৲। Mir Mahamed খাঁ নামক আর একজন বিখ্যাত চিত্রকরের তৈরী মুহছিন খানের ছবিখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মীর মহাম্মদ খাঁ ইটালিয়ান পরিব্রাজক Manuchi সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাহারই অনুরোধে তিনি তৈমরলঙ্গ হইতে আওরাঙ্গজীব পর্য্যন্ত সমস্ত সম্রাট ও যুবরাজগণের ছবি অঙ্কন করিয়াছিলেন। এ যুগের—

১। চান্দ মহম্মদ কর্ত্তৃক ইখলাস খাঁ নামক একজন নীগ্রো কর্ম্মচারীর ছবি

২। ছজমল কর্ত্তৃক নবাব সাহেব কিবলু আজিজ খাঁ বাহাদুরের ছবি

৩। মহম্মদ কজল কর্ত্তৃক একটি রমনীর ছবি এবং আরও অনেক ছবি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

১৮৩৪-৩৫ সনের অঙ্কিত ৬০ খানা munative ছবি পরিশোভিত কামরূপের Romance ইতিহাস এখন Bibliothece Natuate এর French Collection এ সংরক্ষিত আছে।

উপরিলিখিত নাম গুলি হইতে ইহা বুঝা যায় যে রাজ দরবার হইতে বাহিরে আসিয়া চিত্র শিল্প অন্যান্য ছোট ছোট রাজন্যবর্গের দরবারে জ্যোতি বিস্তার করিতে লাগিল। সম্রাট

জাহাঙ্গীরের পরবর্ত্তী সম্রাটগণ খুবই দুর্ব্বল ছিলেন। রাজ্যে ঘোরতর বিপ্লব আরম্ভ হওয়ায় তাঁহাদের শিল্প চর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকিলেও তাহা আর কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। Court patronage এর অভাবে রাজধানীতে আলো নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু অধীনস্থ আমীর ওমরাহদের দরবারে চিত্র-শিল্প তাহার ক্ষীণ রশ্মি বিকীরণ করিতে লাগিল। আর private painters গণ রাজদরবারের ছবি অঙ্কন পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় ছবির প্রতিকৃতি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পরিশ্রমের অনুরূপ পারিতোষিক পাইলেন না। অর্থাভাবে শিল্প চর্চ্চার প্রতি শিল্পীদের আর তেমন অনুরাগ রহিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অযোধ্যার নবাবের দরবারে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত শেষ হাসিটুকু হাসিয়া চিত্র শিল্প মোগল ভারত হইতে বিদায় লইল।

মোগল যুগে চিত্র-শিল্পের যে কতটুকু চর্চ্চা হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। জগতের চিত্র শিল্পের ইতিহাসে মোগলদের Potrait ও miniature paiuiting এর স্থান অতি উচ্চে। এই সমস্ত চিত্রের বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। Vincent Smith সাহেবের Fine arts in India and Ceylon, Havel সাহেবের Indian sculpture and painting, Benyon Arnold সাহেবের Court-painters of the great Mugalএ যে সকল ছবি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে মোগল চিত্র শিল্পের বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ধর্ম্মে নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও মোগল রাজগণ যে চিত্র চর্চ্চাকে একটা প্রাণের জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, শিল্পীকে যথোচিত আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিতে পরিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় ভারতের চিত্র ইতিহাসে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ইহাই তাঁহাদের যথেষ্ট গৌরবের বিষয়। মোগল রাজত্বের ইহাই একটী বিশেষ সার্থকতা। ধর্ম্ম ও কলা শিল্পের যুগপৎ উন্নতি সাধনই মোগল শাসনের বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য। পৌত্তলিকতা বা ঈশ্বরত্ব দাবীর সহায় বলিয়া যে শিল্প চর্চ্চাকে, মানুষের স্বভাবগত ধর্ম্মকে ও তাহার স্বাভাবিক প্রেরণাকে চাপিয়া রাখা হইয়াছিল মুগল যুগে তাহার পূর্ণ স্ফূরণ হইয়াছিল। মোগল বাদশাহ্‌গণ সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মে তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনেও ধর্ম্মের আইন কানুনগুলি বিশেষ ভাবে পালন করিতেন; কিন্তু তাঁহারা জ্ঞানী ছিলেন, নিরক্ষর মুসলমানদিগের মত ধর্ম্ম পালনটাকে একটা formalityতে পরিণত না করিয়া ধর্ম্মের যাহা সুন্দর, যাহা সত্য তাহাই তাঁহারা আঁকড়িয়া ধরিতেন। মূল সত্যকে পিছনে রাখিয়া কেবল কতকগুলি বাজে নিরর্থক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের জীবনকে নিরানন্দ ও প্রাণহীন করিয়া তুলিতেন না।

একটী বিষয় লক্ষ্য না করিলেই চলে না। মোগল চিত্র শিল্প রাজ শিল্প ছিল। সেই জন্য সাম্রাজ্ঞীদের বা অন্তঃপুর বাসিনীদের যত ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাহাদের অবিকল প্রতিচ্ছবি নহে। ইটালির পরিব্রাজক Mameci সাহেব এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অসূর্য্যম্পশ্যা হেরেম রমণীদিগকে চিত্রকরেরা কখনও দেখিতে পাইতেন না। তাই তাঁহারা বাঁদী দাসীদের ছবি অবলম্বনে কল্পনা হইতে সম্রাট মহিষীদের ছবি আঁকিয়াছিলেন।

মোগল যুগের চিত্রের মধ্যে আমরা বিশেষ কোন সামাজিক চিত্র দেখিতে পাই না। সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীদের, আমিরওমরাহ ও তাঁহাদের বেগমদের প্রতিচ্ছবি, তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ, পশু পক্ষী ইত্যাদি ছবিই বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কখন কখন ফকিরের নাচ, মোল্লার কোরাণ পাঠ, দরবেশদের আড্ডা ইত্যাদি ধর্ম্ম জীবনের ছবিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুত ও বৌদ্ধ শিল্প যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও তাহার আচার ব্যবহারের ইতিহাস অঙ্কণ করিয়াছিল, মোগল চিত্রে আমরা তাহা পাই না। মোগল চিত্র ছিল Secular, Realistic and Eclectic.

সম্রাট ও আমির ওমরাহদিগের উৎসাহেই ইহার উৎপত্তি ও উৎকর্ষ, তাঁহাদের বিরাগেই ইহার অবনতি ও বিনাশ। মুসলমান অতীত গৌরব গাহিতে খুব ভালবাসে, অতীতের কাসুন্দি ঘাঁটিয়াই তাহারা নিরস্ত হইয়া যায়। মোগলেরা নিজেদের জীবন যে ভাবে সুন্দর ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল তাঁহাদের পরবর্ত্তী যুগের মুসলমানগণ সভ্য জগতে বাস করিয়া নিজদিগকে সভ্য বলিয়া দাবী করিয়াও তাঁহাদের মত জীবনকে সুন্দর ও শক্তিশালী করিয়া গঠন করিতে পারে নাই। যে বিদ্যা ও শিল্পে একদিন মুসলমান জগতের দীক্ষাগুরু ছিল ও আজ অজ্ঞ ও মূর্খ তথাকথিত ধর্মনেতাদের স্বার্থ বিজড়িত উপদেশ অনুসারে চলিয়া সেই মুসলমান নিজদের জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মের আদেশগুলি সময়োপযোগী ছিল। ঘোর পৌত্তলিকতার যুগে চিত্র ও ভাস্কর্য্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ার সার্থকতা ছিল। ভাস্কর্য্য পৌত্তলিকতার যতটুকু সহায়, চিত্রশিল্প ততটুকু সহায় হইতে পারে না। তাই মুসলমানগণ ভাস্কর্য্য শিল্পের চর্চ্চা করিতে পারে নাই। তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বর্ত্তমান মুসলমান ধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রাণের জিনিস চিত্রকে গ্রহণ করিতেছে না। বর্ত্তমান যুগে চিত্র শিল্প যে কেবল একটা ভোগের জিনিস তাহা নয়, জীবিকা নির্ব্বাহেরও যথেষ্ট উপায় বটে; একথা মুসলমানের চক্ষে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দেখাইলেও তাহাদের চক্ষে দোজখের চিত্র ভাসিয়া উঠিবে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান যুগে আবদুর রহমান চাকদাই, জালালউদ্দীন চাকদাই আবদুল আজিজ প্রভৃতি কয়েকজন মোগল বংশীয় চিত্রকর মোগল শিল্পের বিলুপ্ত-প্রায় অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। Modern Review, Basumati ইত্যাদি মাসিক পত্রিকাগুলিতে যথারীতি তাহাদের চিত্র প্রকাশিত হইতেছে। কবে তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলমান জাতির ভিতরে আরও শিল্পীর আবির্ভাব হইবে এবং তাঁহাদের সুনিপুণ তুলির প্রভাবে ধর্ম্ম-ভীরু নরকভীরু জীবন্মৃত সমাজকে একদিকে প্রকৃত নিষ্ঠাবান্, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও শক্তিশালী এবং অন্যদিকে সুন্দর ও তেজোদীপ্ত করিয়া তুলিবে?

বাঙ্গালার লুপ্ত শিল্প

—রকীব উদ্দীন আহমদ

বাঙ্গালার শিল্পের ইতিহাস এক বিপুল ব্যর্থতার ইতিহাস। একদিন ছিল যখন বাঙ্গালার প্রতি জনপদে ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন না কোন গৃহ শিল্পের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হইত; কাল-পরিবর্ত্তনের অপ্রতিহত প্রভাবে আজ যেন ঐ সকল কোন্ দূরান্তে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বর্ত্তমানে আর্থিক সমস্যার নিপীড়নে অধিকাংশ বাঙ্গালীই জীবন ধারণে অক্ষম; আর শ্রমিকদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় সেই জীবন বড়ই নীরস; বড়ই উদাস; উহাতে স্বাদ নাই,—আছে শুধু অতীতের অতি ক্ষুদ্র করুণ-মধুর ক্ষীণ স্মৃতিটুকু, আর তারই জড়িত সুখ-স্বপনের ক্ষীণতর পুলক-শিহরণ!

আজকাল বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায় কৃষিকর্ম্ম কিন্তু এই ব্যবসায় কোনো অর্থনৈতিক পরিণতি (Economic Evolution) অথবা বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থার জন্ম বিকাশের ফল নহে। ইহা একদিকে বিদেশী শিল্পের অবৈধ প্রতি যোগিতা ও অপর দিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় আপেক্ষিক-ব্যয়-বাদের (Theory of Comparative cost) প্রত্যক্ষ পরিণাম, এই নিয়মের বশীভূত হইয়া প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যে দেশ যে দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে (Best relative advantage) উৎপাদন করিতে পারে, সেই দেশ কেবল সেই দ্রব্যই উৎপন্ন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য দেশ হইতে অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। থিওরীর দিক দিয়া ইহা অর্থ শাস্ত্রের একটী সুন্দর ব্যবস্থা বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে উহার যে সকল অশুভ ব্যতিক্রম সংঘটিত হয়—বিশেষতঃ যখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা একীভূত হইয়া পড়ে—তখন অর্থ-নৈয়ায়িকের অগাধ পাণ্ডিত্যেও কোন সুফল হয় না। অবাধ বাণিজ্য (Free trade) সকলেরই অভিলষিত; তবু সকল দেশেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংরক্ষণ-নীতির (Protection) প্রয়োজন কেন? কারণ জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া আজও মানুষ রাজনীতির শাসনে অর্থ-নীতিকে চাপিয়া রাখিতে চায়।

অর্থশাস্ত্রে একটা কথা আছে "Exports pay for the imports"—অর্থাৎ আমরা বিদেশ হইতে যত টাকার মাল আমদানী করি ঠিক তত টাকার মাল আমাদিগকেও বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হইত তার অধিকাংশই ছিল শিল্প-দ্রব্য; একণে আর্থিক ও অন্যবিধ ঐতিহাসিক কারণে ঐ সকল শিল্প নষ্ট হওয়ায় বাঙ্গালী-শিল্পিগণ কৃষিক্ষেত্রে বিতাড়িত হইয়া বিদেশী শিল্প-যন্ত্রের খাদ্য সরবরাহ করিতেছে। পূর্ব্বে যে সকল পণ্য দ্রব্য বাঙ্গালা দেশে উৎপন্ন হইত, তন্মধ্যে মসলীন, সিল্ক, তসর, পট্টবস্ত্র, কাগজ, চিনি, লৌহ, লবণ, নীল, চা, সোরা, বাঁশের জিনিষ, শাঁখা, মাটির বাসন এবং নানা প্রকার রং বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বস্ত্রশিল্প।* অতি প্রাচীন কালেও ভারতীয় বস্ত্র সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। মিঃ ইয়েট্‌স্‌ তাহার "Tesitrinum Antipuorurn" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে খৃষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কার্পাস-বস্ত্র গ্রীসদেশে বিক্রীত হইত। প্রফেসার উইল্‌সন্‌ তদীয় "Introduction to the Rigveda Samhita" নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের বস্ত্র-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এরিয়েন্‌ তাহার "Periplus of the Erythrean Sea" নামক পত্রিকায় বঙ্গের মসলীনের কথা লিখিয়াছেন।

বয়ণ ও বস্ত্র-শিল্পের জন্য ঢাকা জিলা বঙ্গের শীর্ষ স্থানীয় ছিল। প্রাচীন যুগে বেবিলনিয়া ও এসিয়ার চরম সভ্যতার দিনেও ঢাকাই মসলীন জগতের আদরণীয় হইয়াছিল—এই কথা ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালার শিল্প দ্রব্য নৌকা যোগে প্রাচীন পেলেষ্টাইন বন্দরে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হইত। মস্‌লীন ব্যবসায়ের সাহায্যে আধুনিক সভ্যতার পথ প্রদর্শক রোমক নগরী শ্রী সম্পন্না হইয়াছিল। ডাঃ ইউরি তদীয় Cotton 'Manufacture of Great Britain' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—Muslin of Dacca Constituted the Seriac vestes which were so highly prized by the ladies of Imperial Rome in the days of its luxury & refinement."

যদিও অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঢাকাতে মসলীন প্রস্তুত হইত; তথাপি মুসলমানদের সময়েই এই শিল্প উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। মসলীন সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অত্যন্ত প্রিয় বস্ত্র ছিল; এই জন্য দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর মসলীন শিল্পের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাট ঔরঙ্গজীবও মসলীনের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন; এমন কি যাহাতে এই বস্ত্র বিদেশে না যাইতে পারে এই জন্য রাজাদেশ প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আরো দেখিতে পাওয়া যায় যে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে মসলীন বস্ত্রের বিশেষ কোনো নির্দ্দিষ্ট নাম ছিল না; তাঁহারাই বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য্যানুসারে মসলীনকে, ঝুনা রং, সরকার আলী, খাসা, শবনম, আবরোচান, আলাবাল্লি তাঞ্জেব, তরন্দাম নয়ন-সুক, বদন-খাস, সেরবন্দ, সরবতি, কুমিস ডুড়িয়া থার খান (ছয় প্রকার—নন্দন সাহী, থানার দাশ, সাকুতা, বাছাদার কুস্তিকার) জামদানি, মলমলখাস ও জঙ্গলখাস ইত্যাদি মুসলমানি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ঝুনা শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম। 'ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ ইহাকে অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন দেববালাগণের কোমল করসম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।' টেইলর সাহেব তাহার Topography of Dacca গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Those gossamer like muslins were made which have been compared (?) to the work of fairies rather than of men.

* এই প্রবন্ধ যোগেন বাবুর 'ঢাকার ইতিহাস' ডবলিউ ডবলিউ হাণ্টার প্রণীত Statistical Account, Imperial gazetteer of India এবং অন্যান্য আর্থিক ইতিহাস (Economic History) ও গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠে লিখিত।—লেঃ

পারসী 'খাস' শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। এই বস্ত্রকে আবুল ফজল আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে "কসাক" নাম প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মলমলের নামই জঙ্গল খাস। মলমলে খাস সাধারণতঃ দিল্লীর সম্রাটগণের ব্যবহারের জন্যই প্রস্তুত হইত। উহা এইরূপ সূক্ষ্ম ছিল যে ২০ হস্ত দৈর্ঘ্য ও এক গজ প্রস্ত একখানা বস্ত্র খণ্ড একটী অঙ্গুরীয়কের ছিদ্রের ভিতর দিয়া একদিক হইতে অনায়াসে অপর দিকে টানিয়া লওয়া যাইত। উহার ওজন প্রায় ৮ তোলা এবং মূল্য তৎকালেই প্রায় ১০০৲ টাকা ছিল।

শবনম শব্দের অর্থ "সান্ধ্য শিশির।" সন্ধ্যাকালে উহাকে শ্যামল ঘাসের উপর আস্তীর্ণ করিয়া রাখিলে প্রাতে শিশির-নিষিক্ত দুর্ব্বাদল বলিয়া ভ্রম হইত। বোল্ট সাহেবের Consideration in the affairs of India" গ্রন্থে একটা গল্প আছে যে একদিন পরীক্ষাস্থলে নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ এক খণ্ড শবনম মলমল তৃণের উপর ফেলিয়া রাখিয়া ছিলেন, ঘাসভ্রমে একটী গাভী ঐ বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড উদরসাৎ করিয়াছিল।

আবরোচান্ শব্দের অর্থ "স্বচ্ছ-সলিলা"। ইহা জলের সহিত এইরূপ ভাবে মিশিয়া যাইত যে জল হইতে উত্তোলন না করিলে কেহ উহাকে চিনিতে পারিত না। জামদানি কাপড়ের বয়ন কার্য্যে ২০০ হইতে ২৫০ নম্বরের সূতা ব্যবহৃত হইত। ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই বস্ত্রের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। উহার মূল্য অন্যূন ২৫০৲ টাকা ছিল। ১৭৭৩ খৃঃঅব্দে নায়েব নাজিম মহম্মদ রিজা খাঁ একখানা জামদানী বস্ত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য ৪৫০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই বস্ত্র বিশেষভাবে মোগল সম্রাটদের জন্যই প্রস্তুত হইত। পরবর্ত্তীকালে মুরশিদাবাদের নবাবগণ ইহার রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এইরূপে বিভিন্ন নামের মলীন বিভিন্ন দিক দিয়া বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের মহাসভার নিম্ন বিভাগের (House of commons) আদেশ অনুসারে ১৮৫১ খৃঃঅব্দে প্রকাশিত "Trigonometrical survey of India" নামক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে "ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা এই নদ নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে প্রায় ১৯৬০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূখণ্ডের সমুদয় স্থানেই মসলীন প্রস্তুত হইত। ঢাকা, সোনার গাঁও, ডেমরা ও তিতবদ্দি নামক স্থানে ভুবন বিখ্যাত মলমল প্রস্তুত হইত; এতদ্ব্যতীত নুরাপারা, বালিয়া পাড়া, আবদুল্লাপুর ও কলাকোপা ইত্যাদি স্থানেও নানাপ্রকার বস্ত্রের অনেক অনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ঢাকাই মসলীনের প্রতিপত্তি নষ্ট হয় নাই। ১৮০০ খঃ অব্দে ঢাকা নগরে ৪৫০০০০৲ টাকার, সোনার গাঁয়ে ৩৫০০০৲ টাকার, ডেমরাতে ২৫০০০০৲ টাকার ও তিতবদ্দিতে ১৫০০০০৲ টাকার মসলীন প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা সহরে ১৫০০, সোনার গায়ে ৭০০, ডেমরাতে ৯০০, তিতবদ্দিতে ৩৫০ এবং মুড়াপাড়া, আবদুল্লাপুর ও অন্যান্য স্থানে ৭০০ সর্ব্বশুদ্ধ ৪১৫০ খানা তাঁত ঢাকা জিলাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।" ১৮৬১ খৃঃ অব্দে বিলাতের শিল্প প্রদর্শনীতে ঢাকাই মসলীনের সঙ্গে ইউরোপীয়

মসলীনের তুলনা করা হইলে, ঢাকাই মসলীনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে "The textile manufacture and costumes of the people of India" নামক গ্রন্থে মিঃ এফ ওয়াটসন লিখিয়াছেন " With all our machinery and wondrous appliances we have hitherto been unable to produce a fabric which for fineness and utility can equal the 'woven air' of Dacca."

যদিও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও এসিয়ার অন্যান্য স্থানে মসলীনের যথেষ্ট সমাদর ছিল তথাপি উহার প্রারম্ভ কালেই ইউরোপের পথ ইহার জন্য রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঢাকাতে সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করে। সেই কুঠির উপরে বর্ত্তমান কলেজিয়েট স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। ফরাসীগণ এই দেশে আসিয়াছিল ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে; কিন্তু ১৭২৬ অব্দের পূর্ব্বে তাহারা ঢাকাতে বাণিজ্য আরম্ভ করিতে পারে নাই। আহসান মঞ্জিলের সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীর পারে তাহাদের কুঠি স্থাপিত ছিল; বর্ত্তমান ফরাসগঞ্জ তাহাদেরই প্রতিষ্ঠিত। টেভারনিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীতে জানা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওলন্দাজগণ ঢাকাতে ব্যবসায় আরম্ভ করে; বর্ত্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের উত্তর পশ্চিম কোণে তাহাদের কুঠি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

"ঢাকার বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি, গৌরব, প্রসার ও প্রতিপত্তি ইউরোপীয় বণিককুলের ঈর্ষ্যানল প্রদীপ্ত করিয়াছিল।" ১৭০০ খৃঃ অব্দে স্কটলণ্ডের অন্তর্গত পেইসলী নগরে সর্ব্ব প্রথম ঢাকাই মসলীনের অনুকরণে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হয়; ১৭৮১ খৃঃ অব্দে তাহাদের সেই চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছিল। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম সূতার কল ব্যবহৃত হয়। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে লঙ্কা সায়ারে মাত্র ৪১টি সূতার কল বিদ্যমান ছিল; ঐ বৎসর ঢাকার শুল্কাগার হইতে ৫০০০০০০৲ টাকার (খরিদ দর) বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৭৯০ হইতে ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের মধ্যে ঢাকার অধীনস্থ আরং হইতে ১৩৬২৬০১৮॥৶৬ টাকার বস্ত্র ক্রীত হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতেই যাহাতে ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডে পৌছিতে না পারে ইংরেজগণ আইনের সাহায্যে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮০১ খৃঃ অব্দে ঢাকাই মসলীনের উপর শত করা ৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য হইল। ইংলণ্ডের কল কারখানার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু শিল্প (young industries) রক্ষা করিবার জন্য শুল্কের হার আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সার জর্জ বার্ডউড লিখিয়াছেন "১৭৮৫ খৃঃ অব্দে নটিংহাম নগরে সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইলে ঢাকার মসলীন শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়,······ইংলণ্ডের শিশু শিল্পের উন্নতিকল্পে এবং শিল্প চাতুর্য্যে ঢাকার তন্তুবায়গণের সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য মসলীনের উপর শতকরা ৭৫৲ কর সংস্থাপিত হইয়াছিল। এত অধিক পরিমাণ শুল্ক দিতে হওয়ায় ঢাকার বস্ত্র ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্রাদির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। সুতরাং ঢাকার বস্ত্র-শিল্প

উত্তরোত্তর বিলুপ্ত হইতে লাগিল। "Imperial Gazetteer of India (Eastern Bengal and Assam)' গ্রন্থে লিখিত আছে Dacca Mnslins were introduced in England about 1670, and the trade flourished till the end of the 18th century, as much as 30 or 40 lakhs being expended annually in the purchase of cloths for export to Europe. The Industry could not, however, compete with English piece-goods made by machinery; and in 1807 thad fallen in value to 8½ lakhs and by 1813 to 3½ lakhs while since 1817, when till commercial Residency was closed the export to Europe may be said to have ceased.' ডাঃ টেলর তদীয় Topography of Dacca" নামক পুস্তকেও এই একই কথা বিবৃত করিয়াছেন।

এইদিকে তন্তুবায়দিগের অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হইতে চলিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এই দেশে আসিয়া দালালের সাহায্যে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। তন্তুবায়গণ এক বৎসরে যেই পরিমাণ টাকার মাল সংগ্রহ করিতে পারিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে উহার চেয়ে অনেক বেশী দাদন দেওয়া হইত; এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া তাহারা প্রতিনিয়ত ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিল। উইলিয়ম বোল্ট শিল্পীদের জীবন কাহিনী লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন—They have been treated also with such injuries that instances have been known of cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind silk.'

১৮২৫ খৃঃঅব্দে মিঃ হাস্‌কিসন্ ভারতীয় বস্ত্র-শুল্ক হ্রাস করিয়া শতকরা ১০৲ টাকায় পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অসাময়িক অনুগ্রহে ঢাকাই বস্ত্র আর উন্নতি লাভ করিতে পারিল না। কারণ তখন বিলাতি সূক্ষ্ম বস্ত্র এই দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইতেছিল। তখনকার বিলাতি ও দেশী সুতার মূল্য-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কাপড়	ঢাকায় প্রস্তুত	কলে প্রস্তুত
১নং ছোট বুটদার জামদানী	২৫৲	৮৲
২নং ঐ	১৬৲	৫৲
জামদানী মেহিপল্	২৭৲—২৮৲	৬৲
১নং জঙ্গল খাস	৩৮৲—৪০৲	২০৲—২২৲
২নং ঐ	২৪৲—২৫৲	৯৲—১০৲
মলমল	১০৲—১১৲	৭৲—৮৲
সলিম	২৮৲—৩০৲	১০৲—১৫৲

ঢাকার বস্ত্রশিল্পকে যদি বল প্রয়োগে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা না হইত তাহা হইলে আজও উহা বিশ্বমানবের প্রিয়তম পরিচ্ছদ বলিয়া পরিগণিত হইত। "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিয়াছেন—"ঢাকার বস্ত্রশিল্প স্বীয় মহিমায় জগৎকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং এই সুযোগে জগতের ধনরাশি শতমুখী জাহ্নবীর ধারার ন্যায় ভারত সাগরে আসিয়া পতিত হইয়াছিল। ঢাকার শিল্পীকুলকে রাজশক্তির বলে, অনুগ্রহ সাহায্যে, আপনাদের পণ্যদ্রব্য জগতের গ্রহণীয় করিতে হয় নাই।" বাস্তবিকই ঢাকার মসলীন বঙ্গের স্বাভাবিক শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সুযোগের অভাবে আজ উহা বিনষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিষয় অবলোকন করিয়া "Topography of Dacca প্রণেতা মহাপ্রাণ টেলর বড় দুঃখেই লিখিয়াছেন—"From this recapitulation of the more prominent facts connected with the sources of industry in this part of the country, it will be seen that the commercial History of Dacca presents but a melancholy retrospect."

মসলিন যে শুধু ঢাকা জিলাতেই হইত এমন নহে; ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত সরাইল পরগণাতে 'তঞ্জিব' নামে এক প্রকার মসলীন প্রস্তুত হইত। ইহা ঢাকার "শবনম" মসলীনের ন্যায় সুন্দর ও সূক্ষ্ম ছিল। উক্ত জিলার চারপাতা গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লাভের একটা প্রকাণ্ড কারখানা ছিল; উহাতে 'বাফ্তা' নামে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। প্রায় ৫০ বৎসর হইল এই দুইটি শিল্পই বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে জানা যায় ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরে সুন্দর মসলীন প্রস্তুত হইত। উভয় স্থানেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিও ছিল, এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না।

মসলীন ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই নানা প্রকার শিল্প ও অন্যবিধ বস্ত্রশিল্পের বিস্তর অনুষ্ঠান ছিল। পূর্ব্বে মুরশিদাবাদের অধিবাসিগণের প্রধান ব্যবসায় ছিল রেশম শিল্প। তাহারা গুটী পোকা (Co-coons) ও তুঁতগাছের (Mullberry) চাষ করিয়া স্বহস্তে সিল্কের সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত করিত। পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সিল্কের ব্যবসায় আরম্ভ করিলে চীন ও ফরাসী দেশ হইতে গুটি পোকার বীজ আনিয়া সিল্কের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তন্তুবায় দিগকে দাদন দেওয়া হইত; ইহার ফলে তাহারা স্বাধীন শিল্পের পদ হইতে ক্রমে দিন মজুরের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। অপর দিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার চাপ ভীষণ ভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। ফলে রেশম শিল্পও মসলীনের ন্যায় লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ফরাসী জর্ম্মাণ যুদ্ধ চলিতেছিল; হয়ত তাহারই অপ্রত্যক্ষ পরিণাম স্বরূপ ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ইহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ ক্রিষ্টফনিস (Cristofonis, an Italian gentle man in charge of the filatures) জাপান হইতে গুঁটি

পোকা আনাইয়া রেশম শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ জিলায় ৩১ খানা রেশমের বামক (silk filatures) বিদ্যমান ছিল। শুধু ইংরেজদের কুঠি হইতে প্রতি বৎসর ২২৮০০০ পাঃ অনুমান ১৭১০০০০, টাকার রেশমী সূতা ইউরোপে রপ্তানি করা হইত। এতদ্ব্যতীত দেশী শিল্পিগণও প্রচুর পরিমাণে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিত। উক্ত জিলায় ১৩৭টা গ্রামে অনূন ১৯০০ তন্তুবায় মাসিক ৫৲ টাকা মাহিনায় মজুরী করিয়া কোম্পানী প্রদত্ত সূতা দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত। কিন্তু তাহাদের জীবন বড় সুখের ছিল না। মুরশিদাবাদের কালেক্টর বাহাদুর লিখিয়াছেন—"The weavers in particular are always in debt, and their appearance very squalid and miserable...... their life is one of sedentary labour passed in filthy houses .... Mirzapur was a flourishing town and its sik weavers were the most numerous class, but now an atmosthere of hopeless decay broods over the whole place." আজ মুর্শিদাবাদের রাজ-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্প শক্তিরও অধঃপতন ঘটিয়াছে।

পাবনা জিলার অন্তর্গত মুনসিদপুর গ্রামে রেশমের কুঠি ছিল; তার ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। পাবনাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই অনেকগুলি স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন তন্তুবায় ছিল। দোগাছা গ্রামে প্রস্তুত ১ জোড়া ধুতি ৫৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইত। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে উক্ত জিলার কলেক্টর বাহাদুর লিখিয়াছেন "তন্তুবায়গণ তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।" বগুড়া জিলাতেও এক সময় রেশম-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই স্থানে অনেকগুলি মুসলমান তন্তুবায় বাস করিত। বগুড়া সহরের পার্শবর্ত্তী স্থানে এখনও তাহাদের অতীত জীবনের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। রংপুর জিলায় রয়না গাছের (castor oil plant) উপর এক প্রকার গুঁটি-পোকা জন্মিত তদ্বারা ঐ স্থানের মুসলমানগণ এণ্ডি সূতা তৈরি করিয়া নিজেদের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিত। রাজসাহীর কার্পাস-শিল্প মুসলমান রাজত্বকালে সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ লোক গৃহশিল্পে লিপ্ত ছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপী রাজসাহী জিলার সর্ব্ব-প্রধান শিল্প ছিল রেশম। ১৮০০ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটী সিল্কের কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিল (১৮৩২ খৃঃ অব্দে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া রামপুর বোয়ালিয়াতে আরো দুইটী কুঠি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু ক্রমে এই শিল্প লুপ্ত হইতে থাকে। পূর্ব্বে প্রায় ৩১ লক্ষ টাকার অনূন ৪০০০০ পাউণ্ড কাঁচা রেশম (raw silk and not manufactured goods) প্রস্তুত হইত। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে ৯৬৬৮৪ পাঃ ৮½ লক্ষ টাকার এবং ১৯০৩-৪ অব্দে ৬৭৭৯ পাঃ আসিয়া পরিণত হয়।

মালদহের শিল্পের ইতিহাস আরো বিচিত্র! গৌড়ের শেষ হিন্দু-রাজ বংশের রাজত্বকালে মালদহের অধিবাসিগণ গুঁটি পোকার চাষ করিয়া স্বহস্তে রেশমী সূতা কাটিয়া বস্ত্র প্রস্তুত

করিত। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শেখ ভিখ নামক জনৈক ব্যক্তি বিদেশের সহিত মালদহী বস্ত্রের ব্যবসায় করিত। কথিত আছে একবার তাহার দুইখানি নৌকা পণ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ হইয়া রুশদেশে যাইবার পথে পারস্য উপসাগরে জল মগ্ন হইয়া যায়।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মালদহে প্রথম কুঠী নির্ম্মাণ করে। ১৭৬০খৃঃ অব্দে একজন ফরাসী ভদ্রলোক বাঙ্গালার রেশম-শিল্পের উন্নতি মানসে এই দেশে আগমন করেন। এবং তাহার কিয়ৎকাল পরেই মালদহ সহরে একটা ফরাসী কুঠি স্থাপিত হয়। স্থানীয় ইতিহাসে অবগত হওয়া যায়, ১৭৬০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিরিশ বৎসর ব্যাপী মালদহী রেশমী-শিল্পের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, কখনও আর সেইরূপ হয় নাই। সেই সময়ে মহানন্দা নদীর উভয় তীরস্থ অধিবাসীদের প্রায় সকলেই এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। কিন্তু এই উন্নতি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮১০ খৃঃঅব্দে ডাঃ বুকানন্ হেমিল্টন (Dr Buchanan Hamilton) যখন মালদহ পরিদর্শন করিতে আসেন, তখন তথাকার রেশমী-শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে যখন চীন ও ভারতীয় বাণিজ্যের এক চেটিয়া বন্দোবস্ত monopoly প্রত্যাহার করা হয়, তখন কোম্পানীও কুঠি উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের দুইশত বৎসর পরে মালদহ জিলায়, হয়ত ইউরোপীয় শিল্প-বস্ত্রের খাদ্য যোগাইবার অভিপ্রায়েই শুধু কাজ করিবার জন্য ৭টি ইউরোপীয় অনুষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাও অধিকদিন টিকিতে পারে নাই।

মালদহ জিলার কলেক্টর সাহেব রেশমী-শিল্পের অবনতির যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ডবলিউ ডবলিউ হানটার প্রণীত "Statistical Account of Bengal" গ্রন্থেও উহা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, মুসলিম বিজয়ের পর হইতেই মালদহী-বস্ত্রের অধঃ-পতন আরম্ভ হইয়াছিল কারণ রেশমী-বস্ত্র পরিধান করা মুসলমান ধর্ম্ম-মতে বিধেয় নহে।' কিন্তু কলেক্টর বাহাদুরের এই উক্তি ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ভারতের বস্ত্র শিল্পের জন্য মুসলমান সম্রাট ও নবাবগণ যত অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপীয়ানদের কথা ত দূরে ভারতের প্রাচীন সভ্যতাভিমানী হিন্দুগণও সেইরূপ চেষ্টা করেন নাই। মুসলমানদের মূল ধর্ম্ম গ্রন্থে সিল্কের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। কোনো কোনো ধর্ম্মপ্রাণ মহিষী মিতব্যয়িতার খাতিরেও যাহাতে বাহিক সৌন্দর্য্যের অতিরিক্ত চাকচিক্য আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতায় ব্যাঘাত না ঘটে সেই অভিপ্রায়ে কেবল প্রার্থনা কালে রেশমী বস্ত্র পরিধান করা অশুভ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। এই ইঙ্গিতের বলে একটা মহাশিল্পের ধ্বংস হইতে পারে না। বিশেষতঃ শেখ ভিখের নাম উল্লেখ করিয়া তিনি নিজের মতকে আরো দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন। মুরসিদাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে বয়ন-শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান করিয়া কেবল মালদহের বিরুদ্ধে তাহাদের ধর্ম্ম-জনিত ক্রোধবহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। আর সকল স্থানের সকল শিল্প নষ্ট হইল বিদেশী প্রতিযোগি-

তার ফলে, কেবল মালদহের বস্ত্র ধ্বংস হইল মুসলমানদের প্রকোপে। মুসলিমের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের এই "দুঃখ লগনে" জগতের শিল্প সম্ভারের নেতা (Industrial leader) আর্থিক গরিমায় গৌরবান্বিত, মহা-শক্তিশালী ইংরেজ রাজ-প্রসূত শান্তি সুখ স্নিগ্ধতার মাঝেও ভারতীয় শিল্পের বিলোপ হইল কেন, তাহার কারণ বাঙ্গালার অনুসন্ধিৎসু অর্থনৈবায়িক কি কেবল সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা ও ভারতের প্রাচীনতা—প্রযুক্ত আর্থিক অবহেলার (Econom c negligence of the past) উপরেই নিক্ষেপ করিবে ?

কাগজ। আজকাল শ্রীরামপুর কাগজের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে কাগজ কুটীর শিল্পের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ঢাকা জিলার অন্তর্গত আরিয়ল গ্রামে অতি প্রাচীন কাল হইতে হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার পুরু কাগজ প্রস্তুত হইত। এই স্থানের ৫০০ ঘর কাগজী কেবল কাগজ প্রস্তুত করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বর্ত্তমানে তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। রংপুর জিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প ছিল কাগজ। এই জিলায় কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ভাগরী, পানিয়ালা ঘাট, দুর্গাপুর, বালাকান্দী ও কোর্সী নামক স্থান সমূহে ১৩০ টী কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে পাট দ্বারা কাগজ তৈরি হইত। প্রতি চারি রিম কাগজ প্রস্তুত করিতে ৭।/০ আনা খরচ লাগিত। শিল্পিগণও প্রতি মাসে ৫৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারিত। পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ কতকগুলি গ্রামে স্বদেশী প্রণালীতে পাট হইতে এক প্রকার কাগজ তৈরি হইত। মিঃ হাণ্টার লিখিয়াছেন 'ইংরেজি কাগজের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জের কাগজশিল্প টিকিতে পারে নাই। আজকাল বঙ্গদেশের অনেক ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিহার উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে গয়া ও সাহাবাদ জিলায় কাগজের বিরাট ব্যবসায় ছিল। গয়ার অন্তর্গত আরওয়ালের মুসলমানগণ অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিয়া ভারতের নানা স্থানে প্রেরণ করিত। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—"It used to have a wide market before Serampare was ever heard of" বাঙ্গালার বাহিরে যাইয়াও আরিয়লের শিল্প বাঁচিতে পারে নাই।

রঞ্জন শিল্প। পূর্ব্বে কুসুমফুল ও নীলের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে রঞ্জনশিল্প বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ঢাকার তন্তুবায়গণ লাল, নীল, বাসন্তী, হরিদ্রা, সবুজ ও কাল রং দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিত। অনুন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত কুসুম ফুলের রং বিদেশের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রস্তুত রঙের সম্মুখে টিকিতে পারে নাই।

নীলের ইতিহাস অতীব হৃদয় বিদারক। এই শিল্প অধিকাংশ স্থলেই ইউরুপিয়ানদের একচেটিয়া (monopoly) ছিল। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরা জিলায় মিঃ জে, পি, ওয়াইজ্ কর্ত্তৃক ৪টা নীলকুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এই জিলায় ইউরোপীয় পর্য্য-বেক্ষণের অধীনে শ্রীমদ্দি, দুলালপুর, ব্রাহ্মণচর, মাছেমপুর, ভাঙ্গার চর ও আকা নগর প্রভৃতি স্থানে ছয়টী নীলকুঠি নির্ম্মিত হয়। নীলকুঠির কর্ম্মচারিগণ সামান্য কিছু দাদন প্রদান করিয়া

সন্নিকটস্থ কৃষক ও মজুরদের নিকট হইতে অত্যধিক পরিমাণে কাজ আদায় করিয়া লইত। কোন বিশেষ কারণে কর্ম্ম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে না পারিলে, অথবা দাদনের টাকা ফেরত দিতে চাহিলে, নিঃসহায় গ্রামবাসী দিগের উপর ভীষণ অত্যাচার উৎপীড়ন করা হইত। অবশেষে চাষীদের 'সঞ্চিত ব্যথা' বিদ্রোহের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়া পড়িল। কথিত আছে— কোন স্থানীয় জমিদার প্রজাদের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; এবং তাহারই উপদেশ মতো এক রাত্রে একই সময়ে সব গুলি কুঠি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে মালদহ জিলায় ২০টা নীলকুঠি ছিল। সেই বৎসর মালদহে প্রায় ৪০০০ হাজার মণ নীল উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই জেলায় অধিকাংশ নীলের অনুষ্ঠান বিদেশী মূলধনে পরিপুষ্ট হইলেও, এইখানে কতকগুলি দেশী কারখানা ছিল যাহাতে দেশের টাকাতেই কারবার চলিত। ১৮৬০ খ্রীঃঅব্দে পাবনা জিলার সর্ব্বত্রই নীলকুঠি বিদ্যমান ছিল; ঐ সকলও ইউরুপিয় মূলধনে পরিচালিত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাবনার নীল-শিল্প ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত মুরশিদাবাদের রেভিনিউ সার্ভেয়ারের রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায় যে এই জিলায় ১২টা বিভিন্ন অনুষ্ঠান হইতে প্রায় ৭ লক্ষ টাকার নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৮৫৯-৬০ খ্রীঃ অব্দে বিপ্লব আরম্ভ হইলে মুরশিদাবাদের নীল শিল্প বিনষ্ট হইয়া যায়। এই বিপ্লবের সময় অধিবাসীদের দুঃখের সীমা ছিল না। Revenue Surveyor লিখিয়াছেন— "Murshidabad witnessed the serious case of loss of life which took place during the troubled times, in an attack upon a factory."

পরাধীন জাতি বলিয়া বাঙ্গালী রঞ্জন শিল্পের মূল্য অনেকটা বুঝিতে পারে না। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানী রং বন্ধ করিয়া দিলে মিত্র শক্তিকে যে কী ভীষণ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অবাধ বাণিজ্য (Free trade) পন্থী গ্রেট ব্রিটেনও রঞ্জন শিল্পের উন্নতি কল্পে বিদেশী রঙ্গের উপর সংরক্ষণী শুল্ক (Protective duty) সংস্থাপন করিয়াছে। বঙ্গদেশে যাহা ছিল তাহা নাই; অন্য দেশে যাহা ছিল না তাহা হইতেছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাঙ্গালার বিবিধ শিল্পের সামান্য আভাস দেওয়াও অসম্ভব। পূর্ব্বে বাঙ্গালী কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল না। লৌহ, লবণ, চিনি, বাসনপত্র ইত্যাদি সকল বস্তুই নিজের দেশে পাইত। ঢাকাতে যখন মুসলমান রাজধানী ছিল তখন ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত লোহাইদ, মির্জ্জাপুর, কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতি স্থানে লৌহের কারখানা ছিল। ঐ লৌহ দ্বারা যুদ্ধের যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। ঐ সমস্ত স্থান খনন করিলে এখনও নানা প্রকার যন্ত্রাদির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ঐ স্থানে লৌহের খনি ছিল বলিয়া আবুল ফজল 'আইন- ই - আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

সূচী কর্ম্মের জন্য বোগদাদ নগরী চির প্রসিদ্ধ। বোগদাদ হইতে মুসলমানগণ সর্ব্ব প্রথম সিবন শিল্প ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। '১৫৪০ খ্রীঃ অব্দে সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে

সূচ প্রচারিত হয়।[১] এই সূচীকর্ম্ম ঢাকাতেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। মুরশিদাবাদের অন্তর্গত পাগলা নদী তীরস্থ বেলিয়া নারায়ণপুরে লৌহের বাজার ছিল। ঐ স্থানে লৌহ প্রস্তুত করিবার জন্য ৬২ খানা উনন (Furnace) দিবারাত্রি প্রজ্জ্বলিত থাকিত।

দেশীয় প্রণালীতে লবণ প্রস্তুত করিয়া বঙ্গের অধিবাসীগণ নিজেদের অভাব পূরণ করিত। নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জিলায় পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত। অনেক দিন হইল লিভার পুলের লবণ আসিয়া এই সকল বিনষ্ট করিয়াছে। চট্টগ্রামে—

১৮৬৫-৬৬ খৃঃ অব্দে লিভারপুল হইতে ১২৪৩ টন
১৮৭০-৭১ " " " ৩১৫৫ "
১৮৭৩-৭৪ " " " ৭৭৫২ "

লবণ আমদানী হইয়াছিল। এই উভয় স্থানের লবণ প্রস্তুতকারিগণ এক্ষণে কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে ইক্ষু ও খেজুরের চাষ করিত এবং তদ্দ্বারা গুড় চিনি ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। ফরিদপুর,ঢাকা,ময়মনসিংহ এই তিনটি জিলা মাটির বাসনের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঢাকা,ময়মনসিংহ রাজসাহী, রংপুর প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত কাংস্য দ্রব্য ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে তাহার অনেকগুলি বিনষ্ট হইয়াছে এবং দুই একটি শিল্প মাত্র স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় প্রাচীনতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বাঙ্গালার শিল্প ইতিহাসের সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হয়, আর্থিক নিপীড়নে বঙ্গদেশ উৎপাদন ক্ষেত্রে (Field of production) যেই স্থান অধিকার করিয়াছে এই কি তার চরম অবস্থা না কুটীর ও অন্যান্য শিল্পের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা আছে? ভারতের প্রাচীন সভ্যতা শুধু ভারতবাসীর নৈতিক উন্নতি ও শাস্ত্র-জ্ঞানের মধ্যেই পর্য্যবসিত হয় নাই; আর্থিক জীবনও তাহাদের সুন্দর মধুর ছিল। মাঝখানে একটা অনৈসর্গিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে মাত্র। আজকালও বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল (raw materials) ও খনিজ পদার্থ (minerals) বিদ্যমান রহিয়াছে; মজুরেরও (labour) অভাবই নাই; মূলধনও (capital) ভূগর্ভে লুক্কায়িত নহে; সমবায় ঋণ-দান সমিতি গৃহ শিল্পের সহায়তা করিতে সতত তৎপর; বিদেশী মূল ধনও এই দেশে নিয়োজিত হইতে প্রতিনিয়ত উৎকণ্ঠিত; অভাব আছে কেবল একটা শক্তির, যাহার নাম সমবেত চেষ্টা বা organisation. এই সকল শক্তির একত্র সমাবেশে বাঙ্গালার 'লুপ্তশিল্প' উদ্ধার করা যাইতে পারে।

যেই দেশ শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে সেইদেশ কখনও আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। আর যেই দেশে আর্থিক সমস্যার সুমীমাংসা হয় না সেই দেশের জাতীয় জীবনে কোনো অধিকার নাই, কারণ সেই দেশ অভিশপ্ত, লাঞ্ছিত, পদদলিত জগতের নিকট ঘৃণ্য ও হেয়। দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া দেশ-

মাতৃকার লজ্জা নিবারণ করিতে হইলে, আত্ম স্বার্থ ও জাতীয় ভাবে প্রমুগ্ধ ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্য দ্রব্য পরিতৃপ্ত না হইয়া "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথা তুলে নিতে হইলে, আত্ম সম্মান জ্ঞান থাকিলে, বর্ত্তমান যুগের হীন সাম্প্রদায়িকতার বাহিরে আসিয়া জাতিভেদ নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীকে সমভাবে দেশে কর্ম্ম ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিতে হইবে।

বাঙ্গালার শিল্পাকাশ এইরূপে কালমেঘে আবৃত; সেই মেঘের আড়ালে দুই এক টি অনুষ্ঠান মাত্র দূরান্তরে নিহারিকার মতো নিষ্প্রভ হইয়া দেখা দিতেছে। কৃষি, শিল্পী ও বাণিজ্যের এক ত্র বিশিষ্ট সমাবেশে দেশের ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক আলোকে সকল অন্ধকার বিদূরিত করিয়া শংখনাদে মিলিয়া বঙ্গ-মাতার মঙ্গলাভিষেকের পূর্ণায়োজন করিতে হইবে।

বাঙলায় পীর পূজা

—সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ

বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে ইসলামের সবচেয়ে বড় দান তার তৌহীদ। বহু পরাজয় ও ব্যর্থতার মধ্যেও শুধু এই মহা সত্যের বলেই সে মানব সমাজে এত বড় গৌরব আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান জগতে যাঁহারা খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যিনি সাক্ষাতে বা পরোক্ষে এই একেশ্বর বাদের পূজারী নন। খৃষ্টান ও বৌদ্ধদের ত্রিত্ববাদের মূলেও আজ একত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে। কোটী কোটী দেবতা পূজা ছাড়িয়া মানুষ আজ ঐ দেবতাগণের সৃষ্টি কর্ত্তাকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। মানবের চিন্তাধারার এই যে ক্রমবিকাশ তাহার মূলে রহিয়াছে ইসলামের সেই তৌহীদ। মহাপুরুষের জীবনে এই সত্য এমনই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে উত্তর কালে যাহাতে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ কোনও রূপ বিপথগামী না হন বা পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ না করেন সেই জন্য মৃত্যুর প্রাক্কালে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন "Raise no stone on my bones for then they may worship the bones instead of the Creator of the Stone." আমরা মুসলমান, মুখে আজ তৌহীদের বাণী বেশ পড়িতেছি, আমরা এক আল্লাহ্‌র উপাসক বলিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কটাক্ষ করিতেও ক্রটী করি না কিন্তু কার্য্যতঃ মুখের কথার কতটুকু অনুসরণ করিতেছি বক্ষমান প্রবন্ধে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই স্থানে আরবের প্রাথমিক ইসলামের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। আরবের যে ইসলাম তাহাতে বাহ্যাড়ম্বর নাই, আলস্য, হিংসা, দ্বেষ, স্বেচ্ছাচারিতা ও বৈরাগ্য নাই—তাহাতে আছে কঠোর সাধনা, ঐকান্তিক জ্ঞানস্পৃহা ও কর্ম্ম-প্রিয়তা-অনাড়ম্বর জীবন, পরমতসহিষ্ণুতা, গণতন্ত্রশাসনপ্রণালী। মহাপুরুষ গরীব অবস্থায় যে সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়াছেন শেষ জীবনে সমগ্র জজিরাতুল আরবের একমাত্র প্রভু ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও বিলাসে গা ভাসাইয়া দেন নাই বরং পূর্ব্বের চাইতেও সংযমী দীনহীন সামান্য নাগরিকের বেশে চলিয়াছেন এ বিষয়ে সমস্ত ঐতিহাসিকই একমত। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় স্থলবর্ত্তী খলিফা হজরত আবু-বকর, ওসমান, ওমর ও আলীর জীবনে ইসলামের এই স্বরূপ শুধু অক্ষুণ্ণ ছিল না বরং আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। হজরত আবু-বকরের সত্যপ্রিয়তা ও গণতান্ত্রিকতা, ওমরের তেজস্বিতা, ওসমানের ধর্ম্ম প্রাণতা ও আলীর জ্ঞান ও বীরত্ব মুসলমানদের বাস্তবিকই গৌরবের সামগ্রী; কিন্তু হজরত আলীর মৃত্যুর পরে আমরা দেখিতে পাই মুসলিম ইতিহাসে স্বেচ্ছাচারী বিলাসী ও পাপাসক্ত এজিদের আবির্ভাব হইয়াছে। তারপর পারস্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার প্রভূত অর্থ ও অপরিমিত ঐশ্বর্য্য মুসলমান খলিফা-

গণকে নিতান্ত অলস কর্ম্মবিমুখ বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলে সুতরাং মুসলমান তাহার plain living and high thinking এর আদর্শ হইতে সরিয়া ক্রমে বিলাসী ও অলস হইয়া পড়ে। ফলে সুফি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। একদল শিক্ষিত পারশী মুসলমান এই আন্দোলনের নেতা। ইস্‌লামের মূলনীতির সহিত তাঁহাদের কোন বিরোধ ছিল না। তাঁহারা কেবল ইস্‌লামের সরল সাধারণ সূত্রগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন মাত্র। ইস্‌লামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া সুফি ঋষিদিগের জ্ঞান, সাধনা ও তপস্যা এক অমূল্য সম্পদ। তাঁদের তপোনিষ্ঠা, ত্যাগ ভক্তি, প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা অসামান্য ও আলৌকিক ছিল। তাঁহাদের মূলমন্ত্র ছিল প্রকৃত জ্ঞান, প্রেম ও সত্যদীপ্তি। কিন্তু সামাজিক দিক দিয়া তাঁহাদের কাহারও হজরতের আদর্শ হইতে একটু বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। হাফেজ তাঁহার সুপসিদ্ধ "দেওয়ান কাব্যে লিখিয়াছেন" বা, মায়সুজ্জাদা রঙ্গিন কুন্ গারৎ পীরে, মগাঁ গুয়াদ, কে সালেক্ বেখবর না বুয়াদ যে রাহ্ রেস্‌মে মনজিল হা।

অর্থাৎ যদি পীরে বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তুমি তোমার জায় নামাজ সরাব দিয়া রঙ্গিন করিয়া লও—কারণ পীরই তোমার পথের খবর জানেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইস্‌লামের মূল নীতির সঙ্গে সুফিদের কোন বিরোধ ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা এতগুলি সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে সাধারণ জ্ঞানে মানুষ তাহা ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং এই মতবাদে মুক্তি লাভ করিতে হইলে একজন পীর বা জ্ঞানী লোকের সাহায্য অত্যাবশ্যক। এই রূপেই আমাদের পীর সম্প্রদায়ের প্রথম সৃষ্টি হয়।

এদেশে যে ইস্‌লাম আসিয়াছিল, তাহা বিন্ কাসিম বা তৎপরবর্ত্তী আরব ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। তারপর স্থলপথাগত পাঠান ও মোগল সম্রাটগণ কর্ত্তৃক অথবা কোন organised missionery র সাহায্যেও এদেশে ইস্‌লাম প্রচারিত হয় নাই। শুধু কতকগুলি সাধক ও আউলিয়ার ঐকান্তিক চেষ্টা ও তাঁহাদের নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও অসামান্য গুণাবলীর প্রভাবেই এদেশে ইস্‌লাম এমন ভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে যে সব মহা পুরুষ আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে শাহ্-জালাল, সাহ্-জামাল ও শাহ্-মস্তানের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাহ্-জালালের সঙ্গে ৩৬০ জন ও তৎপরে আরও ১২ জন আউলিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা একত্রে সারা বাঙ্গালায় বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-বাঙ্গালার বহু অঞ্চলে ইস্‌লাম প্রচার করেন।

এই সব আউলিয়াদের নিকট যাহারা ইস্‌লামে দীক্ষালাভ করিয়াছিল, তাহাদের অধিক সংখ্যকই ছিল বৌদ্ধ সহজিয়া মতাবলম্বী। সহজিয়াদের মূলমন্ত্র ছিল তিনটী। গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা, সেই উপদেশ মত পঞ্চকামের উপভোগ করা, ও সেই উপভোগে যে সহজানন্দলাভ তাহাতেই বোধিপ্রাপ্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করা। এই গুরুবাদ অর্থাৎ গুরু ভিন্ন শিষ্যের কোন গত্যন্তর নাই, তখনকার সহজিয়াদের মনে বড় প্রবল ছিল। মুস্‌লমান

হইবার পরও তাহাদের মনে ঐ গুরুবাদের ছাপ থাকা মোটেই আশ্চর্য্যজনক নয় বরং স্বাভাবিক। কাজেই তখনকার মুসলমান কোন মতেই খাঁটী মুসলমান হয় নাই। সে শুধু মুখে তৌহিদের উপাসক হইলেও কার্য্যতঃ গুরু বা পীরপূজা এবম্বিধ পৌত্তলিকতায়ই মগ্ন ছিল। এই দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে আবার অনেকেই অন্যান্য হিন্দু ও বৌদ্ধ সহজিয়াদিগকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এ দেশে পীর পূজা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

অপর দিকে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় হইতে যাহারা মুসলমান হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যাই ছিল বেশী। কারণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে প্রেম ও ভক্তি মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ দেশের মুসলমান সাধকদের জীবনে সে প্রেম ও ভক্তি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যের তিরোধানের পর বৈষ্ণবগণ উক্ত সাধকের তপোনিষ্ঠা ও নির্ম্মল চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু এই বৈষ্ণবদের মনেও গুরু আতঙ্ক বাদ বা পীর পূজা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাহাদের মতে 'When God is angry, Guru will protect us but when Guru is angry there is no one to protect us' ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে এই সম্প্রদায় হইতে দীক্ষিত মুসলমান পীর পূজার দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করে নাই। তাহা ছাড়া সাধারণ মানুষ সব দেশে সব কালেই পৌত্তলিক। অজ্ঞতার দরুণ সে নিরাকার সত্তাকে প্রাণের মধ্যে খুব আঁকড়িয়া ধরিতে পারে না, আর পারিলেও তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। এ দেশে তৌহিদ জন সাধারণের মুখেই রহিয়াছে তাহাদের অন্তরের ধন হইতে পারে নাই। তাহারা পীর পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ২ দরগা পূজা, কবর পূজা, কালী পূজা, রোগের দেব-দেবী ওলা বিবি পূজা ও শীতলা দেবী পূজা অর্থাৎ যে তিমির সেই তিমিরেই যাইয়া পড়িয়াছিল। Gait সাহেব তাঁহার ১৯১১ খৃঃ অব্দের Census Report এ পূর্ণিয়ার Settlement Report হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে "Attached to almost every house is a little shrine called khudaighar or God's house where prayers are offered indifferently to Allah or Kali. বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের যখন ঐ অবস্থা—যখন সে না হিন্দু না মুসলমান, তখন ওহাবী আন্দোলনের স্রোত আসিয়া তাহাকে খাঁটি মুসলমান করিতে চেষ্টা করিল।

মহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব দেশে নেজদ্ সহরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন ইসলামে যে সমস্ত কুসংস্কার কুনীতি প্রবেশ করিয়াছিল সে সমস্ত বিদূরিত করিয়া উহাতে পূজার সরলপবিত্রতা ফিরাইয়া আনাই উক্ত আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার মতে প্রত্যেক মুসলমানই স্ব স্ব যুক্তি ও চিন্তাশক্তি দ্বারা কোরাণকে বুঝিবার অধিকারী; কাজেই চারি ইমামের বিশিষ্ট দাবী তিনি অগ্রাহ্য করিলেন; ও পীর পূজা, দরগাহ পূজা ও অন্যান্য সকল প্রকার কুসংস্কার ও অমুসলমানত্ব হইতে মুসলমানদিগকে মুক্ত হইতে আদেশ করিলেন।

ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথম ওহাবী মতে দীক্ষিত হন রায় বেরিলির সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ আহমদ খান সাহেব। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যাঁটী শরিয়ত প্রচার করিয়াছিলেন উক্ত আহমদ সাহেবের শিষ্য জৌনপুর নিবাসী মৌলানা কেরামত আলী সাহেব ও ফরিদপুর নিবাসী হাজি শরিয়ত উল্লা ও তদীয় পুত্র দুদু মিঞা সাহেব। শরিয়ত উল্লা সাহেব ১৮২০ খৃঃ অব্দে হজ করিতে যান ও তথায় ওহাবী মতে দীক্ষালাভ করেন। দেশে আসিয়া তিনি সর্ব্ব প্রথমে মুসলমান দিগকে, হিন্দুর আচার ব্যবহার অনুকরণ, তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে যোগদান, মহরম উপলক্ষে তাজিয়া নির্ম্মাণ, পীর পূজা ও পয়গম্বর পূজা করিতে নিষেধ করেন। তিনি আরও বলেন ভারতবর্ষ দারুল হারব (mansion of war) সুতরাং এখানে জুম্মার নামাজ পড়ার দরকার নাই। তাঁহার মতাবলম্বিগণ আজও জুম্মার নামাজ পড়ে না এবং অনেকেই শুধু মক্কা শরিফ হইতে হজ করিয়া ফিরিয়া আসেন; মদিনায় যান না। তিনি অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন ঢাকা ও ফরিদপুরেই তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বেশী ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সুযোগ্য পুত্র দুদু মিঞা সাহেব, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালী, পাবনা প্রভৃতি জিলার কৃষক ও শিল্পী মজুরদের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেন। লোকদিগকে স্বীয় মতে আস্থাবান রাখিবার জন্য তিনি স্থানে স্থানে এজেণ্ট বা প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সকল মুসলমানকে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি সমাজে অনেক সদনুষ্ঠানে হাত দিয়াছিলেন কিন্তু জমিদারদের কুচক্রে গভর্ণমেণ্টের বিষ নয়নে পড়াতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। ওদিকে মৌলানা কেরামত আলী সাহেব একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। আজ যে বাঙ্গলাদেশে পীরদের এত দৌরাত্ম্য, তাহার জন্য হয়ত তিনিই অনেকখানি দায়ী। তিনি ইমামদের দাবী একেবারে অগ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহার মতে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ দারুল হারব নয়। কাজেই জুম্মার নামাজ পড়া উচিত। হিন্দুর আচার ব্যবহার অনুকরণ ও কুসংস্কার বর্জ্জন সম্বন্ধে তিনি দুদু মিঞা সাহেবের সঙ্গে এক মতই ছিলেন। কিন্তু তিনি পীরদিগকে সম্মান করিতে এমন কি পীরদের কবরে প্রার্থনা ও দান খয়রাত করিতেও আদেশ করিলেন, যেহেতু তাঁহার মতে পীর মুরিদের জন্য আল্লাহর নিকট মধ্যস্থতা অর্থাৎ advocacy করিতে পারেন। তিনি ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তদীয় পুত্র হাফিজ মহম্মদ সাহেব পিতার বাণী সমস্ত পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রচার করেন। ফলে মুসলমান ছোট খাট কুসংস্কারের হাত হইতে অনেকটা নিজকে মুক্ত করিয়া লইলেও পীরদের নাগপাশ ছিন্ন করিতে পারিল না। যে ওহাবী আন্দোলনের বন্যা পীর পূজা ধ্বংস করিতেই আসিয়াছিল, উহা বাঙ্গালায় শুধু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াই গেল না, অধিকন্তু পীর পূজার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিল। পীরত্ব বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবনে তখন এক অভিনব রূপ প্রাপ্ত হইল। সে তৌহিদকে যেমন মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তেমনি পীর যে তাহার একমাত্র পরকালের সহায় ইহাও ততটুকু প্রাণ দিয়াই বিশ্বাস করে। এ ধারণা আজ তাহার জীবনে একান্তই বদ্ধমূল যে জীবনের কোন না কোন

সময় পীর না ধরিয়া পরকালে তাহার মুক্তি নাই। বৈষ্ণবদের গুরুবাদের মত "when the guru is angry there is none to protect these" সে আরও বিশ্বাস করে পীর ভালই হউক আর মন্দই হউক একবার ধরিলে আর ছাড়া যায় না।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান পীর সম্প্রদায়কে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যথা :—

১। দুদু মিঞা সাহেবের মতাবলম্বী যাহাদিগকে আহলে হাদিস মোহাম্মদীবলে।

২। মৌলানা কেরামত আলী সাহেবের মতাবলম্বী—তাঁহাদিগকে ফেরাজী বলে।

৩। উক্ত দুই দলই শরিয়ত পন্থী অর্থাৎ শরিয়ত মানেন; তা ছাড়া আর এক দল মারফতী পীর আছেন, তাঁহারা শরিয়তের কোন ধার ধারেন না।

এতদ্ভিন্ন আর অনেক প্রকার পীর আছে, যাহারা মারফতীও নয় শরিয়তীও নয়—এ দুই এরই সংমিশ্রন যথা :—চট্টগ্রামের মাইজ ভাণ্ডারী, ত্রিপুরার লেংটা ফকির ও ময়মনসিংহের পাগলা শক্তি। ইহাদের প্রত্যেকের সাধন প্রণালী, আচার পদ্ধতি বিভিন্ন। কেহ বা খৎনা কর'য় না, ছাতা মাথায় দেয় না ও জুতা পায় দেয় না, যেমন ময়মনসিংহের পাগলা শক্তি। কেহ বা নাচ গান দুইই সমর্থন করে, যেমন মাইজ ভাণ্ডারী, কেহ বা শুধু গায় নাচেনা—কেহ বা নাচে কিন্তু গায় না।

মুরিদ বা শিষ্য করিবার প্রণালী :—সাধারণতঃ পুরুষ হইলে পীর সাহেবের হাতে ধরিয়াই মুরিদ হয়। মেয়েলোক হইলে পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া পীরের হাত হইতে লম্বা করিয়া টানা একখানা চাদর, বা পীরের পাগড়ীর কোণ ধরিয়া মুরিদ হয়। মুরিদ হওয়া আর কিছুই নহে, পীরের শিজিরাতে বিশ্বাস করা অর্থাৎ পীর সাহেব যদি বংশানুযায়ী পীর হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার পিতা, পিতামহ কেমন করিয়া হজরত আলী হইতে বংশ পরম্পরায় পীর হইতে হইতে ঐ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন মুরিদকে ধীরে ধীরে বলিয়া যান, আর যদি বংশানুযায়ী পীর না হন তাহা হইলে তাঁহার পীর ও পীরের পীরগণ কেমন করিয়া হজরত আলী হইতে ক্রমান্বয়ে বড় পীর দাস্তগীর হজরত আবদুল কাদির জিলানী মরহুম সাহেবের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন, আস্তে আস্তে বলিয়া যান; মুরিদ তোতা পাখীর মত পীরের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া যায়। সে যে কি জিনিষ বিশ্বাস করিল তাহা সে নিশ্চয়ই জানে না, কারণ উর্দ্দু তাহার বোধগম্য নহে। সে মাত্র এইটুকু বুঝিল যে ঐ পীর সাহেব সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার পরকালের এক মাত্র সম্বল কোন কোন পীরের শিজরা তাহার মুরীদের জীবনের অভেদ্য কবচ। প্রত্যহ ঐ শিজরা পাঠ করিবার এবং চুমা ও তাজিম করিবার জন্য মুরিদের উপর কড়া হুকুম থাকে। এমন কি মৃত্যুর পর ঐ শিজিরা শরিফ মৃত মুরিদের বুকের উপর দিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে যেহেতু এই শিজরার বরকতে নাকি পরকালের অনেক পাপ ও গোর আজাব মাপ হইয়া যাইবে।

আজকাল এই মুরিদ করিবার কালীন কোন কোন পীরের অঙ্গভঙ্গী আহঙ্কারী ও ভণ্ডামি এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। সাধারণ লোকের মনাকর্ষণ করিবার জন্য তাহারা যে কত প্রকার অলৌকিকত্বের ভান করে তাহা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ব্যতীরেকে অন্যের ধারণাতীত।

সাধারণতঃ পীর সাহেব মেয়েলোক মুরিদকে দেখিতে পান না, কারণ পর্দ্দার আড়ালে বসিয়াই তাহাকে মুরিদ করা হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন স্থানে মুরিদ হইবার পর মুহূর্ত্তেই পর্দ্দা সরাইয়া দেওয়া হয়, তখন পীর সাহেব চক্ষু বুঁজিয়া থাকেন; মেয়েলোক মুরিদ তখন খুব ভাল করিয়া তাহার পীরের মুখখানা একবার দেখিয়া লয় যেন রোজ হাসরের দিন বিপুল জন সমূহ হইতে সে তাহার পীরকে বাছিয়া লইতে পারে। এই সুযোগ যে জীবনে কেবল একবার আসে তাহা নয়। যদি শিষ্যা কতকদিন পর পীরে চেহারাখানি ভাল করিয়া স্মরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় ঐরূপ সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেকেই মনে করিবেন আমি এক আজগুবী গল্পের অবতারণা করিয়াছি—কিন্তু এ এক নিছক সত্য। সে পীর এই ঢাকার বুকেই বেশ সম্মানের সহিত বিরাজ করিতেছেন।

ব্যবসাদার পীর

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই দেশে একদল ব্যবসায়ী পীরের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে ইতিমধ্যেই সমস্ত বাঙ্গালা দেশে তাহাদের মুরিদ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত পীর কুসীদ জীবির মত নিতান্ত নির্ম্মমভাবে নানা উপায়ে মুরিদ হইতে টাকা আদায় করিয়া থাকে। আজ বড় পীর সাহেবের এগারই শরিফ, কাল হজরত মাইনদ্দিন চিশতীর ওরুছ, পরশু দাদা পীরের ওরুছ ইত্যাদি বহু উপায়ে সরল কৃষক হইতে টাকা আদায় করিয়া নিজেদেরই উদর পূর্ত্তি করিতেছে। বাস্তবিক ব্যবসা হিসাবে এমন আয়ের অথচ বিনা পুঁজিতে ব্যবসা নিশ্চয়ই আর নাই। তাই কাহাকেও ডিপুটীগিরি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া এই ব্যবসা অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। আজকাল মরহুম কেরামত আলী সাহেবের বংশধরগণও এই ব্যবসাই আরম্ভ করিয়াছে। আপনাদের অবগতির জন্য তাহার একজন ওয়ারিশানের নামে মুদ্রিত হজরতের জুতার নকশা বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া শুনাইতেছি :—

বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহিম

লাওলা কালামা খালাফতুল আফলাক

এই যে নকসা শরিফ দেখিতেছেন ইহা আমাদের নবি ছল্লাহামের বাদসা সফিউল মুজনেবিন, রাহমাতুল্লল আলামিন যাহার উছিলায় চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, পৃথিবী, বেহেস্ত, দুজখ, পাহাড়, পর্ব্বত, জেন, ফেরেস্তা, দানব, মানব, বৃক্ষ, লতা, সাগর, সলিল, অনিল, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি দয়ালু আল্লাহতালা পয়দা করিয়াছেন, ইহা তাহার পবিত্র কদম শরীফের জুতার নক্সা উক্ত নক্সা শরিফ প্রত্যেক মোসলমানের দেখা মাত্রই আসেকের সহিত তাজিম করা কর্ত্তব্য এই নক্সা শরিফকে তাজিম করিলে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে খোদার রহমত

প্রাপ্ত ও দুনিয়াতে নানা প্রকার উপকার পাইবেন যাহারা এই নক্সা শরীফকে তাজিম করিবে দুরুদ শরীফের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবেন ও ছোট, বড় গুনা আল্লাহতালা মাফ করিয়া দিবেন এবং এই নক্সা শরীফকে যাহারা যত্নের সহিত সদা সর্ব্বদা ঘরে রাখিয়া ফজরে ও মগরিবে চক্ষুতে ও মুখে বুছাদিয়া তাজিম করিবে ও দয়ালু নবির কদম শরিফের জুতা বলিয়া তাহার উপর আসেক হইবে তাঁহারা নিশ্চয়ই নবি আলাইহেচ্ছালামকে সপ্নে জিয়ারত পাইবেন। এবং এই নক্সা শরিফ যাহারা ঘরে কিম্বা দোকানে লটকাইয়া রাখিবে সেই ঘরে সয়তান প্রবেশ করিতে পারিবে না ও কলেরা বসন্ত যত রকম গজব যুক্ত রোগ আছে এবং দুনিয়ার সমস্ত বালা মুছিবত হইতে আমানে থাকিবে ও দোকানে বেচা বিক্রি খোদার ফজলে বেশী হইবে ও রুজিতে বরকত হইবে এবং যাহারা কবজ করিয়া হাতে রাখিবে জালেমের জুলুম হইতে সয়তানের ফেরেব হইতে ভূত, পেত্নী, দেও পরির নজর হইতে ও নানা প্রকার বিষ বেদনা, বসন্ত, কলেরা রোগের নজর হইতে আল্লাহতালা বাচাইয়া রাখিবেন এবং সন্তান প্রশব কারিনীর বেদনা উপস্থিত হইলে উক্ত নক্সা শরিফ রোগীর পেটের উপর রাখিয়া ইহার উছিলায় আল্লাহতালার নিকট দোয়া চাহিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা ক্ষান্ত হইবে ও সন্তান প্রসব হইয়া যাইবে ইহার বহুত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে আবুহাফেজ নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে একদা আমার ভয়ানক পেটের বেদনা হয় তখন উক্ত নক্সা শরিফ আমি বাঙ্গালার চেরাগ মৌলানা কেরামত আলী সাহেবের পৌত্র মৌলানা মহাম্মদ আহাম্মদ সাহেবের নিকট হইতে উক্ত নক্সা প্রাপ্ত হইয়া ইহা আমার পেটের উপর রাখিয়া বলিলাম হে খোদাওন্দ করিম হজরতের পায়ের জুতার উছিলায় আমার বিষ আরোগ্য করিয়া দেও ইহার কিছুক্ষণ পরেই আমার বিষ দুর হইয়া গেল সেই দিন হইতে উক্ত নক্সা শরিফকে অতি যত্নের সহিত তাজিম করিতাম। ইহার কিছুদিন পরে আমার বিবির প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া সন্তান প্রসবের জন্য কষ্ট পাইতেছিল তখন উক্ত নক্সা শরিফ পেটে দিয়া পুর্ব্বোক্ত নিয়মে দোয়া চাওয়ায় তৎক্ষণাৎ বেদনা কমিয়া সন্তান প্রসব হইয়া গেল।

হে মোসলমান ভ্রাতাগণ আমার নিবেদন এই পাক নক্সা শরিফ যে প্রত্যেকেই সামান্য জাকাত সরূপ খরচ দানে গ্রহণ করিয়া দিন দুনিয়ার ছোয়াব হাছিল করিবেন। যাঁহারা ইহা গ্রহণ করিবেন নাপাক শরীরে হাত লাগাইবেন না। ইতি—

প্রকাশক—

মৌলানা মহাম্মদ আহাম্মদ সাহেব
জোনপুর নিবাসী মৌলানা কেরামত আলী
সাহেবের পৌত্র

প্রাপ্তি স্থান—

খাকছার বান্দা
হাজি মহাম্মদ মালেক হুছেইন
মোকাম ভৈরব বাজার
জিলা ময়মনসিংহ

হাঃ মোঃ মথুরাপুর, (পাবনা জিলা)
পোঃ আঃ চাটমোহর।

দরগাহ সম্বন্ধে সামান্য দুটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের শেষ করিতেছি। এ দেশে দরগাহ আছে, তন্মধ্যে শ্রীহট্টে শাহজালের, ময়মনসিংহে শাহ কামালের, বগুড়ায় অসংখ্য মস্তান, ত্রিপুরায় খরমপুর ও চট্টগ্রামে মাইজভাণ্ডারের বাজেবস্থান দরগাহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক দরগাতে একদল খাদেম আছে। তাছাড়া কতক ফকির দরবেশও দেখা যায়।

এই সব দরগাহতে তৌহিদ বাদী মুসলমান যারা (যার কলমায় বলে লা-সরিকাল্লাহ— আল্লার কোন সরিক নাই) কিরূপ ঘৃণ্য পৌত্তলিকতার অভিনয় হইতেছে, তাহা যাহারা দেখেন নাই তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি একবার যাইয়া দেখিয়া আসুন। কিন্তু কবর পূজা ও অন্যান্য মানত কুসংস্কারের কথা বাদ দিয়া, সেখানে আজ কাল যে নানা পাপাচার ও ব্যভিচারের তাণ্ডব লীলা শুরু হইয়াছে সে দৃশ্য বড়ই ভয়ানক। যাঁহারা জলধর বাবুর কাশীর বৃত্তান্ত ও তারকেশ্বরে মোহান্তের ঘটনা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন আপন ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

উপসংহারে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাঙ্গালী মুসলমান আজ পথভ্রান্ত। ইস্লামের তৌহিদ যে আজ তাহারা নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে না এর মূলে আছে শুধু অজ্ঞতা ও তথাকথিত আলেম সমাজের ভণ্ডামি। তার সাংসারিক জীবন বড় শুষ্ক ও মরুময়। নানারূপ করভারে সে আজ প্রপীড়িত। তার উপর পীরের অত্যধিক টেক্স যোগাইতে২ তার জীবন নিতান্তই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মের নামে তার উপর দৌরাত্ম্য না করিয়া তার অন্ধকার হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ শিখা জ্বালিয়া দিতে হইল। তবেই সে আপনা হইতে পীর পূজা ও কুসংস্কার ছাড়িয়া তৌহিদের আদর্শ অনুসরণ করিবে।

মানব মনের ক্রমবিকাশ

—কাজী মোতাহার হোসেন

কবি যখন ভাবের প্রাচুর্য্যে নির্ঝরের বন্দনা করে, বসুন্ধরাকে সম্বোধন করে, এবং দুরন্ত সাগরকে তাহার গান শুনায়; যখন সে পর্ব্বতের সঙ্গে কথা বলে, কোকিলের সঙ্গে আত্মীয়তা করে এবং সমীরণের নিকট মনোবেদনা জানায়; তখন আমরা বিদ্রুপের হাসি হাসি না— সম্ভাব্যতার তর্কও করি না, আমরা প্রাণ দিয়া অনুভব করি। আমাদের হৃদয়ের কোন্ নিভৃত গোপন কন্দরে, কি যেন এক অনির্দ্দেশ্য অথচ পরিচিত সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। কোন্ অতীত যুগের হারানো কাহিনী যেন অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে। সে যুগ মানব ইতিহাসের শৈশব কাল; আর সে কাহিনী বোধ হয় শিশু-চিত্তের কল্পনা-রঞ্জিত স্মৃতি। সে যুগে এই সব চিন্তা মানুষের মনকে সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার করিয়া থাকিত। বর্ত্তমানে যাহা কবিতার অলঙ্কার মাত্র, সে যুগে তাহা জীবনের সত্য ঘটনা ছিল। তখন, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল; বৃক্ষ-লতা প্রভৃতিও তাহাদের নিকট প্রাণ-যুক্ত ও বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিল।

সেই আদিম যুগে মানুষের নিকট সূর্য্য এক মহা শক্তিশালী দেবতা ছিল, যাহার হাস্যে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত এবং ক্রোধে উত্তপ্ত প্রান্তর ধূ-ধূ করিত। পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড ঘুমন্ত দৈত্য ছিল, যাহা সময় সময় একটু নড়িয়া চড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইত। মানুষ জীবিতকালে ঐ দৈত্যের পিঠের উপর দিয়া চলাচল করিত, মৃত্যুর পর তাহার পেটের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিত। আগুণ এক বন্য দুরন্ত প্রাণী ছিল, যাহা স্পর্শ করিলে দংশন করিত। পশু পক্ষীরা বিদেশী ছিল, যাহাদের স্বতন্ত্র ভাষা এবং আচার পদ্ধতি ছিল। বৃক্ষ লতা বাক্‌হীন প্রাণী ছিল, তাহাদের কতকগুলি মানুষের হিতকরী বন্ধু এবং কতকগুলি অনিষ্টকামী শত্রু ছিল।

এই সব বস্তু ও প্রাণীকে তাহারা ঠিক মানুষ ভাবিয়াই তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিত। তাহারা কখনও একটা সুন্দর কাঁটাল গাছ বা নারিকেল গাছকে ফুল সাজে সাজাইত; কখনও বা ফল-দায়ক বৃক্ষকে পূজা উপচারে সম্মানিত করিয়া ফল প্রার্থনা করিত। তাহারা কতকগুলি প্রাণীকে বুদ্ধির জন্য সম্মান করিত, কতক গুলিকে হিংস্র বলিয়া ভয় করিত এবং কতক-গুলিকে উপকারী বলিয়া কদর করিত। এই জন্য এই সব জন্তুকে বধ করা, এমন কি তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করাও ভয়ানক অন্যায় মনে করিত। পাছে হিংস্র জন্তুর সমাজ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এই ভয়ে তাহারা সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না; বরং নানা উপচারে উহাদিগকে পূজা করিত। এইরূপ নিসর্গের অন্যান্য শক্তির কৃপা দৃষ্টি লাভের জন্য, তাহাদের উদ্দেশ্যে পূজা ও বলিদান করিত। কিন্তু সময় সময় দুই চারি জন অসাধারণ সাহসী পুরুষ ব্যাঘ্র ভল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নির্গত হইত। এমন কি সময় সময় মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ুকে তরবারী দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত,

স্ফীতবক্ষ নদীর স্রোতকে বল্লমের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিত, দুর্দ্দান্ত সমুদ্রকে বেত্রাঘাতে শাসন করিত, নির্দ্দয় পৃথিবীকে শাণিত ছুরিকা দ্বারা বধ করিত। আকাশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উন্নত সৌধ নির্ম্মাণ করিত এবং স্বর্গ জয় করিবার জন্য মেঘের গায়ে তীর ছুড়িত।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি উৎকর্ষ লাভ করিল। তখন তাহারা আবিষ্কার করিল যে, দেহ হইতে পৃথক একটি জিনিষ মানুষের ভিতর আছে। সেই জিনিষটি জড় দেহকে চালনা করে। সেই মন বা আত্মা কিম্বা তদ্রূপ কোন ভৌতিক অদৃশ্য পদার্থই চিন্তা করে, সেই-ই আকাঙ্খা করে, সেই সিদ্ধান্ত করে। শরীর যখন নিদ্রায় অচেতন, তখনও ইহা জাগ্রত থাকিয়া ঘুমন্ত মানুষের অন্তঃকরণে চিন্তা ও কল্পনার জাল বিস্তার করে। যখন তাহারা দন্তহীন পক্ককেশ বৃদ্ধের নিকট হইতে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করে, তাহারা বুঝিতে পারে যে শরীরের সঙ্গে আত্মা জরা-গ্রস্ত হয় না—সুতরাং ইহার মৃত্যু নাই। দেহটি আত্মার বাহন মাত্র। এখন প্রশ্ন হইতেছে, দেহ ধ্বংশ হইয়া গেলে তদাশ্রয়ী আত্মার কি অবস্থা হয়?

প্রিয়জনের বিচ্ছেদে তাহার চিন্তা ও স্মৃতি সর্ব্বদা মনে হইতে থাকে। তন্দ্রা-অবস্থায় তাহার প্রতিমূর্ত্তি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, তাহার সুমিষ্ট কোমল ধ্বনি শ্রুতি গোচর হয়, তাহার মধুর স্পর্শ অনুভূত হয়। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তর্হিত হইলেও, অনেকের মনে বিশ্বাস থাকিয়া যায়, যে সত্যই প্রিয়াস্পদের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রধানতঃ ভাব হইতেই এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে। হয়ত তাহাদের সর্দ্দারের মৃত্যু হইয়াছে। অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় তাহার প্রতিকৃতি আসিয়া যেন তাহাদিগকে শাস্তির ভয় দেখাইতেছে। সুতরাং তাহার সহজেই বিশ্বাস হয় যে সর্দ্দার জীবিত আছে। এইরূপে মৃত্যুর পর পারে জীবন আছে, এই ধারণার উৎপত্তি হয়। আত্মার মোকাম বা বাসস্থান স্বরূপ এই দেহের যখন ধ্বংস হয়, তখন আত্মা অবাধে বাতাসের মধ্যে চলাচল করে। ইহা বাতাসের মতই অদৃশ্য; বাতাসের মতই ভয়াবহ নিষ্ঠুরও হইতে পারে। ইহা হইতে অসভ্য মানুষের মনে এই ধারণা হয় যে আধি ব্যাধির যন্ত্রণা তাহার সর্দ্দারের প্রদত্ত শাস্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। তাহার ইহাও বিশ্বাস হয় যে, যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তাহাদের সর্দ্দারের আত্মা অদৃশ্য অস্ত্র লইয়া তাহাদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করে। এই Father spirit এর সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য তাহার উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয়, তাহার সমাধির পাশে খাদ্য সম্ভার যোগান হয়। প্রকৃত পক্ষে তখনও তাহাকেই সর্দ্দার বলিয়াই মনে করা হয়—এবং এই সব কল্পিত সর্দ্দারকে দেবতা আখ্যায় ভূষিত করা হয়। প্রত্যেক সর্দ্দারই দেহ ত্যাগের পর দেবতার আসন ও সম্মান পাইতে থাকে। জীবিত সর্দ্দার যেন এই সব দেবতাদের পুরোহিত; ইনি দেবতাদের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন বলিয়া সময় সময় শাস্ত্র বা আদেশের প্রবর্ত্তন করেন। সর্দ্দারদের গৌরব জনক বীরত্ব কাহিনী অবলম্বন করিয়া গীত রচিত হয়, তাহাদের জীবন বৃত্তান্ত বংশ-পরম্পরায় ঘোষিত হইতে থাকে, এবং ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত হয়।

মানুষ স্বভাবতঃই নিজের মনের রঙ্গে জগৎকে রঞ্জিন করিয়া দেখে। "He reasons from himself outwards" সে মনে করে, নিজের ভিতরে যেমন জড় ও চিন্ময় পদার্থ আছে, সেইরূপ সামান্য তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থেরই এক জড় ভাগ আর একটি সূক্ষ্ম ভাগ আছে। দেবতার মন্দিরে বা সমাধি স্থানে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহার সূক্ষ্ম অংশ দেবতারা ভোগ করেন, জড় অংশ যেমনকার তেমনই থাকিয়া যায় নদী কেবল জল মাত্র নহে যে শুকাইয়া গেলেই নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার মধ্যে এক আত্মা বাস করে,—তাহার মৃত্যু নাই। কিন্তু মানুষ যতই সমষ্টিকে ধারণা করিতে সক্ষম হয়, ততই তাহাদের দেবতার সংখ্যা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা প্রত্যেক বৃক্ষের এক একটি দেবতা কল্পনা করিয়া সমগ্র বনের একটি দেবতা স্বীকার করে; প্রত্যেক নদীর স্বতন্ত্র দেবতা স্থলে একটি মাত্র জল-দেবতা বিশ্বাস করে; প্রত্যেক নক্ষত্রের পৃথক পৃথক দেবতা-স্থলে, সমগ্র আকাশের একটি মাত্র দেবতার ধারণা করে। এইরূপে প্রকৃতি একদল দেবতার শাসিত বলিয়া অনুমিত হয়। স্থল বিশেষে কৌলিক দেবতাদিগকে ইহাদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়, আবার কোথায়ও বা স্বতন্ত্র ভাবেই ইহাদের পূজা হয়।

এই সমস্ত দেবতা আদিম মানুষের নিকট প্রভু বা সম্রাটের ন্যায়। তাহাদের চরিত্র ও মানবীয় চরিত্র; কারণ প্রত্যেক জাতিই নিজেদের চরিত্রের উচ্চতম আদর্শের দ্বারা দেবতার চরিত্র কল্পনা করে। কোন কোন দেশে শুভ এবং অশুভ দুই প্রকার দেবতা আছে। উপ-দেবতাগুলিকে স্তুতিবাক্য এবং উপহার দ্বারা সন্তুষ্ট করা যায়, শুভ দেবতাগুলিকেও অবহেলা করিয়া ভীষণ ও ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা যায়। যাহা হউক, যেমন অত্যাচারী রাজাদের ভাগ্যেই স্তুতি উপহার অধিক ঘটে, সেইরূপ অপ-দেবতাগণই অধিক পরিমাণে পূজা উৎসর্গ প্রভৃতি পাইয়া থাকেন।

মৃত্যুর পরে আত্মার স্থিতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রথমে তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাস স্থান ছিল না। সমাধির আশে পাশেই তাহাদের গতিবিধি ছিল। পরে ভূগর্ভে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। পৃথিবীতে তাহারা যে ভাবে জীবন যাপন করিত, ভৌতিক জগতেও তাহারা ঠিক সেই ভাবেই বাস করে। বস্তুতঃ মৃত্যুর পর আত্মার জীবন পৃথিবীস্থ জীবনেরই পরবর্ত্তী অধ্যায় মাত্র। পরবর্ত্তী জীবন, পৃথিবীস্থ জীবনের উপনিবেশ বিশেষ, কাজেই সেখানেও ঠিক এই সমস্ত আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হইয়াই আত্মা বাস করিবে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, এই কারণে তাহার সমাধিপার্শ্বে বা তাহার অভ্যন্তরে, তাহার ব্যবহৃত প্রিয় খাদ্য, অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি রক্ষিত হয়, এমন কি তাহার পত্নী ও দাস-দাসীদিগকেও সময় সময় তাঁহার অনুগমন করিতে হয়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিবর্গ, পরিচ্ছদ, খাদ্য এবং অস্ত্র শস্ত্রের আত্মা প্রেতলোকে তাহার অনুগমন করে।

নরলোক এবং প্রেতলোকে একই দেবদেবী রাজত্ব করে। নরলোকের স্থায়িত্বকাল

অল্প, প্রেত লোকের স্থায়িত্ব কাল দীর্ঘ। কিন্তু উভয় লোকই অনাদি কাল হইতে অবস্থান করিতেছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। মানুষ, কোনকালে পৃথিবীকে আরম্ভ হইতে দেখে নাই বলিয়াই তাহা অনাদি ; এবং সে ইহাকে বৃদ্ধ হইতে দেখে না বলিয়াই ইহা অনন্ত।

নরলোক ও পরলোক পাশাপাশি অবস্থিত। এমন কি সীমা রেখাও খুব সুনির্দ্দিষ্ট নহে। দেবতারা বা প্রেতাত্মারা অনেক সময় রক্ত মাংসের শরীর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করে। স্ত্রীলোককে ভুলান, শত্রুকে উৎপীড়ন করা এবং প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বাক্যালাপ করা, এই সমস্ত তাঁহাদের কাজ। অপর পক্ষে মানুষের মধ্যেও এমন সব মহাশয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা জড় শরীরকে বিছানায় শায়িত রাখিয়া আত্মিক জগতে ভ্রমণ করিতে পারেন, এবং সেখান হইতে বিশেষ ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া মর্ত্তবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারেন। মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মারা অনেক সময়, পৌত্র বা প্র-পৌত্রের রূপ ধরিয়া বংশে পুনঃ প্রবেশ করিয়া থাকেন। বিখ্যাত বিখ্যাত বীর পুরুষ এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণকে অনেক সময় অবতার বলা হয়, অর্থাৎ তাঁহারা দেবতার ঔরসে স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছেন। কখনও কখনও বিশ্বাস করা হয় যে, কোন দেবতা দয়া-পরবশ হইয়া পৃথিবীর দুর্দ্দশা বা বিপ্লব দূর করিবার জন্য দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়া আপনাকে উৎসীকৃত করিয়া থাকেন। কখনও কখনও অসভ্য জাতিরা বিশ্বাস করে যে তাহাদের রাজা প্রকৃতপক্ষে নরদেহধারী দেবতা। কোন কোন দেশে রাজাকে অবিনাশী বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদের বিশ্বাস, রাজা আহার করেন না, নিদ্রা যান না এবং তাঁহার মৃত্যুও নাই। ঐ সমস্ত রাজ্যে পুরোহিতেরাই সর্ব্বে সর্ব্বা। সাধারণ লোকে কোন দরবার লইয়া উপস্থিত হইলে রাজা পর্দ্দার আড়াল হইতে একখানি পা বাহির করিয়া দিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, পুরোহিতেরা গোপনে তাহাকে সমাধিস্থ করিয়া তৎস্থলে অন্য রাজা প্রতিষ্ঠিত করে।

Savage এক অদ্ভুত জগতে বাস করে। তাহারা প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এজন্য তাহাদের প্রত্যেক যন্ত্রণা, প্রত্যেক স্বপ্ন, প্রত্যেক সম্পদ, প্রত্যেক বিপদ—এক কথায় যাহার কারণ নির্দ্ধারণ করা একটু কঠিন, সে সমস্তই দেবতার রোষ বা অনুগ্রহের ফলে সংঘটিত হয়। প্রতিদিন, প্রতি নিয়তই দেবতা তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। এমন কি, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তাহারা স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করে না। তাহাদের বিশ্বাস, কোন না কোন দিন মানুষ দুর্ব্যবহার দ্বারা দেবতাদিগের রোষ উৎপাদন করে, তাহার ফলে দেবতাগণ কর্ত্তৃক নিধনপ্রাপ্ত হয়।

তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অসাধারণ। যদি তাহাদিগকে বলা যায়, "তোমরা যাহাদিগকে দেবতা বল, তাহারা বাস্তবিক পক্ষে নাই" তবে তাহারা কেবল অবাক হইয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসে। তাহাদের পিতা পিতা-মহের বর্ণিত দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস, তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক। বিশ্বাস করিবার জন্য তাহাকে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে

হয় না ; সে প্রাণের সহিত অনুভব করে, তাহাকে যাহা শিখান গিয়াছে তাহাই সত্য। তাহার বিশ্বাস, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির সহচর ও সমপ্রকৃতিক। যতক্ষণ না তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হয়, ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। যদি কোন দেবতা স্বপ্নে, বা তাহার পুরোহিতের মারফতে কোন প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া থাকেন, তবে সে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য জ্ঞান করে না—তাহার দেবতার প্রতি বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও কমে না। সে সহজ ভাবে মনে করে, দেবতা ছলনা করিয়াছেন। দেবতা তাহার নিকট এক বিরাট পুরুষ মাত্র, সুতরাং তাহার পক্ষে ছলনা করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা দোষের বিষয় নহে। তাহার দেবতা স্বেচ্ছাচারী নৃপতি বিশেষ—ক্ষেতের প্রথম ফসল, গাছের প্রথম ফল, পালের প্রথম বাছুর তাহার প্রাপ্য। আবার কখনও কখনও তাহার ভোগের জন্য কুমারী নারী, এবং ভোজের জন্য নর দেহ দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। আর মানুষ প্রকৃতপক্ষে দেব রাজার ক্রীতদাস। সে প্রার্থনা করে—অর্থাৎ ভিক্ষা চায় ; স্তোত্র পাঠ করে, অর্থাৎ স্তুতি গায় ; বলি উৎসর্গ করে—অর্থাৎ কর প্রদান করে। সাধারণতঃ ভয় হইতেই এই সব করে—তবে অনেক সময় প্রতিদানে কিছু বেশী পাইবার আশাতেও করিয়া থাকে। তাহার আকাঙ্ক্ষা বস্তু প্রধানতঃ দীর্ঘ জীবন, ঐশ্বর্য্য এবং পুত্রবতী স্ত্রী। সচরাচর দেবতা সম্বন্ধে তাহাদের মনে যে সব বিদ্রোহের কথা উদিত হয়, তাহা প্রকাশ করিতে ভয় পায়, কিন্তু সময় সময় অসহ্য হইলে তাহার অন্তর্নিহিত যাতনা কথায় প্রকাশ পায়। রোগ শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে সে দেবতাকে অভিশাপ করে আর বলে, "আমার ভিতরটা খোলা করিয়া খাইয়া ফেলিতেছে।" আবার মানুষ যখন নিজের বুদ্ধির চেয়ে উচ্চতর কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তখনও সে দেবতাকে ঠিক চিনিতে পারে না। কারণ দীক্ষা দ্বারা ধর্ম্ম পাওয়া যায় না। একবার সোমালী ল্যাণ্ডের এক বৃদ্ধা বলিয়াছিল "ও আল্লা, তোমার দাঁতে যেন আমার দাঁতের মত কন্‌কনানী হয় ; ও আল্লা, তোমার মাড়ীতে যেন আমার মাড়ার মত ঘা হয়।" খৃষ্টান সম্রাট 'পেপেল' এক সময় নিজের অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "গড্‌কে দেখিতে পাইলে এই মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণ বধ করিতাম, মানুষকে কেন সে মরণাধীন করিয়াছে ?"

মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতার সংখ্যা কেমন করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বেই তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই সংখ্যা যত কম হয়, দেবতার ক্ষমতাও তত প্রসারিত বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। অবশেষে মানুষ যখন বিচিত্র বিশ্বে এক পরিপূর্ণ একত্বের সন্ধান পায়, তখন ক্রমে ক্রমে তাহার মনে একটি মাত্র দেবতার কল্পনা আসে। তখন লোকে বিশ্বাস করে যে সেই 'একমেবা দ্বিতীয়ম' পুরুষটিই সমগ্র বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছেন। প্রথমতঃ এই দেবতা যেন জগতের বহির্দ্দেশে বা উর্দ্ধদেশে নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া রাজত্ব করেন ; এবং আগেকার দেবতাগুলি এই দেবাদিদেবের প্রতিনিধি বা ডিপুটি রূপে পৃথিবীতে কার্য্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তাহারা ফেরেস্তা কিম্বা পয়গম্বর শ্রেণীতে অবনীত (degraded) হন ; তখন লোকের বিশ্বাস হয় যে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ

বিশ্বের সর্ব্বত্র অর্থাৎ "অনলে, অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধরে সলিলে গহনে" বিরাজিত আছেন; এবং ভাল মন্দ সমস্তই তাঁহার নিকট হইতে প্রবাহিত হয়। তবে কোন কোন পদ্ধতিতে তাঁহাকে কেবল শুভ দায়ক বলিয়া কল্পনা করা হয়; অশুভের কর্ত্তা কোন বিদ্রোহী ফেরেস্তা,—যাহাকে খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী মহা শত্রু বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এপর্য্যন্ত আমরা নীতির দিক দিয়া একটি কথাও বলি নাই। পৃথিবীর সৃজন কাহিনী, দেবতা দ্বারা মানুষের শাসন, মৃত্যুর পরে তাহার অবস্থা, এসমস্তই বৈজ্ঞানিক হিসাবে ধরিলে অনুমান বা theory মাত্র। এগুলি প্রাথমিক মানুষের জিজ্ঞাসু চিত্তের কৌতূহল নিবারক যুক্তি মূলক সিদ্ধান্ত। এইগুলি নানা ভাবে ও কল্পনার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া আমাদের নিকট revealed religion বা প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম-বিশ্বাস রূপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এগুলি যুক্তিমূলক বলিয়া আমাদের বুদ্ধির সহিত অনেকটা মিশ খায়। একারণ বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানবও উহা অনেকটা বিশ্বাস করে। কিন্তু নৈতিক হিসাবে ইহার কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পৃথিবী নির্ম্মাণ করিতে ৬ দিনই লাগুক আর ১০ হাজার বৎসরই লাগুক, পৃথিবীর সৃজনকারী এক খোদাই হউন বা তেত্রিশ কোটি দেবতাই হউন, তাহাতে মানুষের জীবন যাত্রার কি আসিয়া যায়? কোন অসভ্য জাতি এক লক্ষ দেবতার শাসনাধীনে আছে বলিয়াই, তাহারা নিশ্চয়ই খুব সাধু সজ্জন হইবে, তাহার কোন স্থিরতা বা guarantee নাই।

মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির ন্যায় নৈতিক বৃত্তিও একটা স্বভাব জাত ধর্ম্ম। ক্রমে ক্রমে ইহার বিকাশ হয়। মানুষের দেবতা যখন তাহারই চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি, তখন মানুষের নৈতিক আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে তাহার দেবতার নৈতিক আদর্শও উন্নত হইতে থাকিবে তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। অসভ্য জাতির সর্দ্দার কেবল তাহার নিজের এবং নিজের পরিবার বর্গের বিরুদ্ধে অন্যায়ের শাস্তি বিধান করে, কিন্তু উহারা আর একটু সভ্য হইলে, সর্দ্দার সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মাবতারে পরিণত হয়। সেইরূপ অসভ্য জাতি দেবতা, তাহাদের নিকট হইতে মাত্র করও বশ্যতার দাবী করে। তাহারা heresy র (ধর্ম্মদ্রোহিতার) শাস্তি দেয়, কারণ তাহা বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ; blasplemyর শাস্তি দেয়, কারণ তাহা contempt of court; কর বা স্তুতি বন্ধ করিলে শাস্তি দেয়, কারণ তাহা রাজ বিদ্রোহ। আবার এই সব অপরাধীকেই সভ্য জাতির দেবতাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি প্রদান করে। কিন্তু সভ্য জাতির দেবতা আরও আদেশ করেন যে, মানুষ, পরস্পরের প্রতিও ন্যায় ব্যবহার করিবে। এই দেবতা এখনও despot, কারণ তিনি মানুষকে তাঁহার স্তুতি গান ও প্রশংসা করিতে আদেশ করেন এবং করও গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল আত্মানুসন্ধী despot মাত্র নহেন। তিনি সুকৃতিশীলকে পুরস্কার দান করেন, এবং দুষ্কৃতিশীলকে দণ্ডিত করেন।

সময় সময় পৃথিবীতে দেখা যায়, সাধুতার পুরস্কার নাই, অথচ অসাধুতার জয় জয়কার হইতেছে। অসভ্যের মনে ইহাতে কোন খট্‌কা বাধে না, কারণ তাহারা মনে করে, কোন

পূর্ব্বপুরুষ কিম্বা আত্মীয়ের দোষে সাধু পুরুষ ও নির্য্যাতন ভোগ করে; আর পূর্ব্ব পুরুষের সুকৃতির ফলে পাপীরও পাপ খণ্ডন হইয়া যায়। অসভ্য জাতির জীবন" ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে সমাজ, ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় না, পরিবারের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়। পরিবারের কোন ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিলে, সেই পরিবারের যে কোন ব্যক্তির রক্ত দ্বারা সেই হত্যার প্রতিশোধ লওয়া হয়। যদি এক পুরুষের মধ্যে সেই রক্ত পাতের প্রতিশোধ না লওয়া যায়, তবে সে বিবাদ চলিতেই থাকে; কারণ ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু হইলেও, সমগ্র সম্প্রদায়ের ত আর মৃত্যু হয় না। সুতরাং অপরাধীর পুত্র পৌত্রেরাই পূর্ব্ব পুরুষের কৃত কার্য্যের শাস্তি গ্রহণ করিবে এ কথা তাহাদের নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।

সমাজের উচ্চতর অবস্থায় এই পারিবারিক ভাবের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিত্বের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তখন মনের বিকাশ খুব দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে। এই সংসারে সকলের প্রতি ঠিক ন্যায় ব্যবহার হইতেছে না, একথা তখন ধরা পড়ে। এ জন্য বিশ্বাস করা হয় যে পর জন্মে ইহকালের বিচারের দোষ ত্রুটি সংশোধন করা হইবে। অন্য কথায় "পরলোকে পুরস্কার ও শাস্তি হইবে" এই বিশ্বাস প্রচলিত হয়। তখন প্রেত জগত বা আত্মিক জগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক অংশে পাপাত্মা ও অন্য অংশে পুণ্যাত্মার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। অবাধ্য পাপাত্মারা অন্ধকার দুর্গন্ধময় স্থানে অনন্তকাল ধরিয়া অসীম যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকিবে। আর ভক্ত পুণ্যাত্মারা সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, সোণার মুকুট পরিয়া, অনন্তকাল ধরিয়া মহাপ্রতাপান্বিত দেবতা বা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সুধা পান করিতে থাকিবে।

বলা বাহুল্য, কর্ম্মপ্রবণ ইউরোপীয় চিত্তের নিকট পরিণামের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা বিশেষ লোভনীয় বলিয়া মনে হয় না। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে স্বর্গের সৃষ্টি হইয়াছে এশিয়াতে। রাজ দরবারে সম্মানিত আমির ওমরাহের পদ অধিকার করা প্রাচ্য মনের চরম আকাঙ্ক্ষা এবং পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরা ক্রম-বিকাশের যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখনকার দিনে দেবতার প্রতি মানুষের মনোভাব, ঠিক রাজার প্রতি প্রজার মনোভাবের অনুরূপ। প্রাচ্য রাজার প্রজারা তাহার সন্তান বা সেবক। এখানে লোকে প্রাণ বধের আজ্ঞা পাইলে, সেই নিদারুণ ফরমাণ চুম্বন করিয়া ভক্তির সহিত নির্ব্বিবাদে শূলে চড়িতে পারে। রাজা তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেও, হাত জোড় করিয়া ভক্তি ভাবে বলিতে পারে, রাজাই দেনে ওয়ালা, রাজাই লেনে ওয়ালা। "রাজার নাম ধন্য হউক।" বিদেশী প্রজা, যে কোন দিন রাজাকে দেখে নাই, কেবলই ট্যাক্স দিয়াছে, সেও যদি শুনিতে পায় যে রাজা বিপদে পড়িয়াছেন, তখন অমনি সে তরবারি বাহির করিয়া আপন আত্ম পরিজন এবং গৃহকে যে ভাবে রক্ষা করিত, ঠিক সেই ভাবে রাজাকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া যায়।

এই প্রকার ভক্তি রাজার প্রতি প্রদর্শিত হইলে রাজভক্তি, দেবতা বা খোদার প্রতি প্রদর্শিত হইলে ধর্ম্ম নিষ্ঠা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে মনোবৃত্তি একই প্রকার। ধর্ম্মরাজ্যও এক প্রকার গভর্ণমেণ্ট বিশেষ। মানুষ ঐহিক নরপতিকে যে সম্মান করিত, অদৃশ্য দেবতাকেও সেই সম্মানে ভূষিত করিয়াছে। অসভ্য সমাজে কেবল ভীতিই এই সম্মান প্রদর্শনের মূল কারণ কিন্তু উন্নত সমাজে ভয়ের সহিত ভালবাসাও মিশ্রিত আছে। ইহাতে মনে এক অনির্ব্বচনীয় সুখকর মিশ্র ভাবের উদয় হয়। পার্থিব রাজার প্রতি পূর্ব্বেকার এই শ্রদ্ধা ও সম্মান অনেক হ্রাস পাইয়াছে, এমন কি কোন ২ দেশে এখন তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। তথাপি অদৃশ্য দেব-রাজার প্রতি তাহাদের মনোভাবের অতটা পরিবর্ত্তন হয় নাই। কে জানে ভবিষ্যতে দেবতার রাজ সম্মান বজায় থাকিবে কি না?

ধর্ম্মভাব ও দেব-পরিকল্পনা সম্বন্ধে ক্রম-বিকাশের যে সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল, ইহা হইতেই সহজে ও পরিষ্কার রূপে বিভিন্ন দেশের রাশীকৃত স্মৃতি, পুরাণ ও কাহিনীর বিজ্ঞান-সম্মত শ্রেণী ভাগ করা যাইতে পারে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে মানুষের ধারণা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এক সমাজে একই সময়ে ক্রম বিকাশের বিভিন্ন স্তর একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই এরোপ্লেনের দিনেও গো-গাড়ী ও একা গাড়ীর অপ্রতুল নাই; ইলেকট্রিক লাইটের দিনেও শত শত ঘরে মাটির টেমী জ্বলিতেছে; সেইরূপ এক ঈশ্বরের ধারণা প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পরেও আমরা প্রকৃতি পূজার শত শত নিদর্শন দেখিতে পাই। হানিবল আর ফিলিপের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাহাতে উভয় পক্ষ বলিতেছেন Jupitor, Juno এবং Apolloর সাক্ষাতে; কার্থেজ বাসীর দেবতা এবং Hercules ও Iolonsএর সাক্ষাতে; Mars, Triton এবং Neptune এর সাক্ষাতে; আমাদের শিবিরে যে সমস্ত দেবতা আছেন তাহাদের সাক্ষাতে; সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবীর সাক্ষাতে; নদী হ্রদ এবং সমুদ্রের সাক্ষাতে শপথ করিতেছি।" সক্রেটিসের সময় এথেন্সের লোক সূর্য্যকে একজন মহাপুরুষ মনে করিত। আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দর বাদশাহ যে কেবল সমুদ্রের দেবতা দিগের উদ্দেশেই বলিদান করিয়াছিলেন, তাহা নহে, (Arrian বলেন) তিনি স্বয়ং সমুদ্রকেও নানা উপহারে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এমন কি Prophet Job এর গ্রন্থেও তারকাগণকে জীবনধারী প্রাণী মনে করিয়া বলা হইয়াছে, যে তাহারা স্বর্গের সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে সঙ্গীত করিয়া ফিরিতেছে।

আবার যে সব দেশে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে, অর্থাৎ এক শ্রেণী প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন ও শিক্ষিত এবং অন্য শ্রেণী অনুন্নত ও অশিক্ষিত, সেখানে বাহ্যতঃ এক ধর্ম্ম থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে দুইটি ধর্ম্মই বিরাজ করে। প্রাচীন Sabeans দের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক নক্ষত্র-বাসী দেবগণকে ভক্তি করিত, অন্য শ্রেণী নক্ষত্র গুলিকেই পূজা করিত। অগ্নি পূজকদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক অগ্নিকে উপলক্ষ্য মাত্র জানিত, অন্য শ্রেণী অগ্নিকেই উপাস্য মনে করিত। পুতুল বা প্রতিমার প্রচলন যেদেশে আছে সেখানে সর্ব্বত্রই এইরূপ

দেখিতে পাওয়া যায়। পুরোহিতেরা প্রতিমাকে ধ্যান ধারণার সহায়ক বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যাহারা পড়িতে জানে না, তাহাদিগকে পুস্তক কিনিয়া দিলেও ফল হয় না। অসভ্য জাতি, মনে করে, তাহার দেবতা ঐ প্রতিমার ভিতর আছে, কিম্বা ঐ প্রতিমাকেই দেবতা মনে করে। শিশু তাহার পুতুলটিকে যে চক্ষে দেখে, ইহারা দেব প্রতিমাকেও ঠিক সেই ভাবেই দেখে। শিশু জানে যে তাহার পুতুল রং করা কাঠ দিয়া প্রস্তুত এবং তাহার ভিতরে হয়ত মটরের দানা কিম্বা করাতের গুঁড়া আছে তবু সে তাহাকে জীবিতের মত ভাল বাসে, শাড়ী পরায়, বিছানায় শোয়াইয়া ঘুম পাড়ায়। Savage এর ভ্রান্তিও ঠিক এইরূপ; কারণ সে কল্পনা শক্তিতে শিশুর সমতুল্য। সেও প্রতিমার সঙ্গে আদর করিয়া কথা বলে, জল দিয়া তাহার পা ধোওয়াইয়া দেয়। তাহার মাথায় ও মুখে তেল দিয়া দেয়, প্রার্থিত জিনিষ না পাইলে অনুযোগ করে।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। দেবতার নৈতিক আচরণও দেশের লোকের নৈতিক আদর্শের অনুরূপ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বেদুইন বা যাযাবর জাতি সচরাচর তাহাদের দলছাড়া অন্যদলের দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ বা লুণ্ঠন করা, অন্য কথায় কাফেরের মাল লুট করা, অন্যায় মনে করে না। তাহাদের দেবতাও তাহাদের মত লুণ্ঠন কারী সর্দ্দার। যখন তাহারা বেদুইন স্বভাব ত্যাগ করিয়া শস্য-শ্যামল প্রান্তরে বাস করিয়া কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং বাড়ীঘর ও সহর নির্ম্মান করিয়া শান্তিতে বাস করে তখন তাহাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হয় - সঙ্গে সঙ্গে দেবতাও চুরি, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি নিষেধ করিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু সময় সময় তাহাদের পূর্ব্বদেবতার বচন বা ক্রিয়াকলাপ লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় এবং ওগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত যুগের লোকেও অপৌরুষের বলিয়া মনে করে। তখন একটা কৌতুকজনক অথচ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে, ধর্ম্ম বিশ্বাস তখনকার লোককে উন্নতির দিকে না উঠাইয়া অবনতির দিকেই টানিয়া নামায়। কাজে কাজেই ধর্ম্ম বিশ্বাসও অনেকটা শিথিল হইয়া যায়। কারণ একই কাজ দেবতায় করিয়া গিয়াছেন বলিয়া লীলারূপে পরিগণিত হইবে, আর মানুষে করিলে তাহার জন্য ফাঁসী কাষ্ঠের ব্যবস্থা হইবে, এই অন্যায় অবিচার শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকে দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারে না।

সাধারণ লোকের মন অত্যন্ত অগঠিত ও অপরিপূর্ণ। এজন্য তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ বাঁধাবাঁধি বিশ্বাস থাকা চাই। সেই অজানিত ও অজ্ঞের পুরুষ বা শক্তি সম্বন্ধে একটা থিওরী থাকা উচিত, যাহাতে বিশ্বাস করিয়া তাহার জিজ্ঞাসু মনের কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু এই Theory যে রূপই হউক না কেন, তাহাকে লোকের বুদ্ধির সহিত সমান তালে চলিতে হইবে। সেই Theory এমন হওয়া চাই, যে অনুসন্ধানের ফলে তাহা বিনষ্ট না হইয়া যেন আরও তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

কিন্তু উন্নত জ্ঞান পিপাসী মন কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া সর্ব্বদা

সন্দেহে আন্দোলিত থাকিবে। তাহারা যে কেবল অতিরঞ্জিত পৌরাণিক কাহিনীগুলিকেই অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহা নহে ; জগতের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য, জ্ঞান মূলক ও নীতিমূলক যে সমস্ত সুকৌশল যুক্ত থিউরী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতেও সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না। তাহারা দিনের পর দিন কেবলই চিন্তা করিতে থাকিবে। ক্রমেই জ্ঞানের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিবে ; কিন্তু দেখিতে পাইবে যে চিন্তার ক্ষেত্র অনন্ত প্রসারিত। তখন সে বুঝিতে পারিবে যে মানব বুদ্ধি সেই সূক্ষ্মচিন্তার ক্ষেত্রে কত দুর্ব্বল, কত শক্তিহীন। তথাপি মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই—সে অনবরত সৃষ্টির গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইটাই মানুষের গৌরব। ইতি মধ্যেই সে দুইটা বিরাট সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমটি এই—জগতের সৃষ্টি ও পরিকল্পনায় আপাতদৃষ্টিতে নানা বৈষম্য দেখা গেলেও প্রকৃত পক্ষে সকলের মধ্যে এক চমৎকার ঐক্যবন্ধন আছে। বিশ্ব যেন এক অখণ্ড বিরাট দেহ, যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি একে অন্যের পরিপূরক। দ্বিতীয়টা এই যে, জগতের সমুদয় নৈসর্গিক ও নৈতিক ব্যাপারই অপরিবর্ত্তনীয় কঠোর নিয়মের অধীন। প্রকৃত পক্ষে, বৃষ্টি অথবা সুবাতাসের জন্য প্রার্থনা করা আর সূর্য্যকে মধ্যাকাশে অস্ত যাইতে বলা সমান হাস্যকর। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা যতটার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, জীবিকার জন্য বা রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করাও ঠিক ততখানি নির্ব্বুদ্ধিতার চিহ্ন ; আবার রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা যতটা অজ্ঞতার লক্ষণ, মানসিক শান্তি বা পবিত্রহৃদয় লাভের জন্য প্রার্থনা করাও তদ্রূপ। পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাই নিয়ম অনুসারে ঘটে। এমনকি যে সমস্ত কাজ মানুষের খামখেয়াল বা খোশমেজাজের উপর নির্ভর করে, তাহাও সমষ্টি হিসাব ধরিলে (statistically) মানুষের ইচ্ছার অধীন নহে। একটী মানুষের জীবন একটি পরমাণুর মতই হেঁয়ালী যুক্ত, কিন্তু সমগ্র মানব সমাজ যেন গণিতের (Problem) হিসাবের ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত। ব্যষ্টি হিসাবে, সে ইচ্ছাশক্তিময় মানুষ, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে সে কলের তৈয়ারী জীব, যাহার এরূপ ছাড়া অন্যরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল।

বিশ্বের একত্ব একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহার সৃষ্টি কর্ত্তাকে একটী মাত্র মহামন বলিয়া ধরিয়া লওয়া সদৃশ-যুক্তি মূলক অনুমান। এই অনুমান হয়ত মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু ইহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসহ অনুমান। তথাপি ইহা অনুমান মাত্র। আর বাস্তবিক পক্ষে, ইহাতে আমাদের সমস্যার অপনোদন হয় না, সত্যাবিষ্কার বেশীদূর অগ্রসর হয় না। পৃথিবী যেন কচ্ছপের উপর অবস্থিত হইল, কিন্তু "কচ্ছপ কিসের উপর আছে?" এই নূতন প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সেই মহামন অর্থাৎ 'আল্লা' যেন জগত সৃষ্টি করিয়া জাগতিক নিয়ম ঠিক করিয়া দিলেন, কিন্তু "আল্লা" কোথা হইতে আসিলেন ? ধর্ম্মকারেরা বলিলেন, খোদা "স্বয়ম্ভূত" অর্থাৎ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; জড়বাদীরা বলিবেন, পদার্থ আপনা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু এ সমস্তই অসার কথা, বিস্ময় বিমুগ্ধ নির্ব্বাক বৈজ্ঞানিকের নিকট এসব কথার কোনই মূল্য নাই। এই সমস্ত ব্যাপার অসীমের ধারণার ন্যায় বর্ত্তমান মনুষ্য-চিন্তার বহির্ভূত।

আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমারা যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন জ্ঞানান্বেষী হিসাবে আমাদের তাহা অনুসন্ধান করা উচিত; এবং যে সমস্ত নৈতিক নিয়মের অধীন, নাগরিক হিসাবে তাহা পালন করা কর্ত্তব্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র আল্লাকে সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করাই বৈজ্ঞানিক হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা কম আপত্তিজনক। কিন্তু একথা প্রথম ঘোষিত হইয়াছিল, সুসভ্য গ্রীকদের দ্বারা নহে, অর্দ্ধ সভ্য বেদুইন আরবদের দ্বারা। প্রথমে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয় যে গ্রীকেরা সর্ব্ব বিষয়ে প্রাচীন আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকিলেও, ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে—যাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও বুদ্ধির সাপেক্ষ, কেন আরবদের নিকট ঋণী হইল? কিন্তু উভয় দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই একথার উত্তর পাওয়া যায়। গ্রীস দেশ, নদী উপত্যকা, ফল, মূল, লতা, পুষ্প বিচিত্র; আর আরবের রিক্ত প্রকৃতি মরুভূমি মাত্রেই পর্য্যবষিত। সুতরাং গ্রীকের মনে একক দেবতার কল্পনা করা কষ্টকর ও অস্বাভাবিক, আরবদের পক্ষে তেমনি বহুতার ধারণা করাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আরবের মরুভূমির মধ্যে হয়ত কতক গুলি পাথর এবং আকাশের চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আমরা জানি আরববাসী প্রথমতঃ এই গুলিকেই দেবতা বলিয়া মানিত। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় তাহাদের প্রাচীন রাজাদের একউপাধি ছিল "সূর্য্য-দাস" বর্ত্তমান যুগেও প্রাভাতিক নক্ষত্রকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু এই দেশের বুদ্ধিমান লোকে চিরকাল, (অন্ততঃ ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই) এক খোদায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। একেশ্বরবাদকে আরব্য ধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরবদের এই একেশ্বর ধর্ম্মই, হজরত এব্রাহিম, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, জশুয়া, সামুয়েল, সল, দাউদ, সুলেমান প্রভৃতির জীবন ঘটনার সংস্পর্শে কিরূপ পরিবর্ত্তিত ও বিকশিত হইয়াছিল, পরে তাহা হইতে কেমন করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম ও ইসলাম উদ্ভূত হইয়া সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সে সমস্ত ইতিহাস চমৎকার হইলেও এখন বলিতে গেলে আপনাদের নিশ্চয়ই ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে। এজন্য আজ আর ক্রম বিকাশের শেষাংশের ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে কোন দিন সে বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াই আজ বিদায় লইতেছি।

ইংরাজী সাহিত্যে রোমাণ্টিক যুগ

—আনোয়ার-উল্ কাদীর এম-এ, বি-টী, বি-এল, বি-ই, এস্

Pope এর সময়ে নীতিগর্ভ উপদেশপ্রদ বা বিদ্রূপাত্মক কবিতা সমস্ত কাব্য জগতকে ছেয়ে ফেলেছিল। ১৭৮৫খৃঃ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কবিতায় আদর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রমে কবিতা জগতে নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়। বাস্তবিক পক্ষে pope এর জীবনের মধ্য ভাগ থেকে Cowper এর Task প্রকাশিত হওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত যে যুগ-তাকে একটি পরিবর্ত্তনের যুগ বলা যায়। পূর্ব্বকার যুগের কবিতার প্রভাব এখনও বিদ্যমান কিন্তু নূতন উপাদান সমূহ, নূতন ভাব রাজি ঘনীভূত হইতে থাকে এবং কবিতার আকার ও আদর্শ বদলাইতে আরম্ভ করে। ক্রমে কবির দৃষ্টি, কবিতার প্রসঙ্গ, ভাষা, ভাব আদর্শ আকার ভঙ্গী সবই নূতন ভাব ধারণ করল যে যুগে—তাকেই ইংরেজী সাহিত্যের রোমাণ্টিক যুগ বলা হয়।

পরিবর্ত্তনের যুগে Johnson এর London, Vanity of Human wishes (১৭৪৯) Robert Blair এর নীরস কবিতা Of the Grave (১৭৪৩) এবং Edward Young এর Night thoughts (১৭৪৩) এবং The universal Passion of fame; Mark Akenside এর The Pleasures of imagination এবং অন্যান্য বিদ্রূপাত্মক কবিতা পাঠ করিলে Queen Anne এর যুগের কবিতার সুর স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু এ দিকে Thomas Gray, William Collins প্রভৃতি কবিগণ Greek কবিদের ধারা এবং ভঙ্গী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। এই সমস্ত কবির ভাষায় অনেক খানি কালের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এঁদের ভাষা অনেকটা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক কিন্তু উপরোক্ত উভয় কবিই সৌন্দর্য্যের উপাসক। অবশ্য Collins এবং Gray উভয়ের মধ্যে Collins এর কবিতাই অপেক্ষাকৃত মধুর, সরস ও সরল। এই কবি Collnins এর Ode to Simplicity নামক কবিতা পাঠে কবিতা কোন্ দিকে ধাবিত হ'তে চাচ্ছে তা স্পষ্ট জানতে পারা যায়। Collins এর, সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা Ode to Evening (সন্ধ্যা সঙ্গীত) Keats এর কবি প্রতিভার সমকক্ষতা করতে চায় এবং এই কবির কল্পনাপ্রিয়তার কথা স্মরণ পথে আনয়ন করে। তাঁর অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কবিতা অনেক সময় কর্কশ এবং প্রকাশ ভঙ্গিমা অপরিস্ফুট; কিন্তু যখন আনন্দের স্পর্শে তাঁর প্রাণ উল্লাসিত বা যখন শান্তির সন্ধানে তিনি বিষাদের ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত, তখন তাঁর কবিতা সত্যের আলোতে প্রতিভাত এবং মাধুর্য্যবিমণ্ডিত। অকাল মৃত্যু তাঁর প্রতিভাকে ষোল কলায় পূর্ণ হ'তে দেয় নি। Gray অনেকটা বিভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর দৃষ্টি পরিষ্কার। Collins এর কবিতার যে একটু খানি রহস্যের মধুর আবরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, Grayর কবিতায় তেমন কিছু দেখা যায়

না। Greek কবিগণের ভক্ত Gray গ্রীক কবিগণের নিকট ভাষার প্রাঞ্জলতা শিক্ষা ক'রে ছিলেন। কালের গুণে তাঁর কবিতা মানব জীবনের নৈতিক সমালোচনা এবং তত্ত্ব দিয়ে ভরা, তাঁর কবিতা ও কষ্টকল্পিত। কিন্তু তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা Elegyতে সমালোচক কবি যে মানব প্রীতির আভাস দিয়েছেন তাতে তাঁর কবি প্রতিভা তখনকার দিনের সাধারণ কবি প্রতিভার সঙ্গে বেমালুম খাপ খেয়ে যায় নি। সংতার সঙ্গে যোগ থাকায় তাঁর অলঙ্কার যুক্ত কবিতাগুলি অস্বাভাবিকও নয়, নীরসও নয়, তিনি নানা প্রকার কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু তাঁর Odes গুলি বিশেষ করে Progress of Poesy "কবি প্রতিভার বিকাশ" কালের প্রভাব অতিক্রম করেছিল। Gray এর সুবিখ্যাত সঙ্গীত চিরকালই ইংলণ্ডের কাছে প্রিয় থাকিবে। কবিতাটীর যেমন রচনা মাহাত্ম্য তেমনি ইহা ইংলণ্ডের আবহাওয়ার সৌন্দর্য্যে স্নাত। কবিতাটী চিন্তাপূর্ণ এবং হয়ত উত্তাপ বিহীন তথাপি মাঝে মাঝে বেশ আবেগ ও উচ্ছ্বাস পূর্ণ কল্পনার অভাবে এবং কালের প্রভাবে Grayর কবিপ্রতিভা পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হ'তে পারেনি কিন্তু এই কবি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সেতুর উপর তার সমশ্রেণী কবিদের সঙ্গে উজ্জল আলোকে সগৌরবে দণ্ডায়মান। পুরাতনের সাহায্যে আরোহণ ক'রে তিনি তার গানে ও ছন্দে যে নূতন দৃষ্টি ফুটিয়েছিলেন তা তিনি তাঁর পরবর্ত্তী কবিগণকে দান করে গিয়েছিলেন।

এ দিকে Elizabethan কবিগণের এবং আরো পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণের যেমন Chavcer এর কবিতার চর্চ্চা খুব আগ্রহের সহিত চলছিল, অবশ্য পূর্ব্বেও Pope ও Dryden উভয়ই Shakespeare ও Chaucer, এর কবি প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু তখন জিনিষটী একটু প্রসার লাভ করেছিল। Pope এর ন্যায় Gray ও ইংরাজি কবিতা সাহিত্যের এক খানি ইতিহাস লেখার মতলব করেছিলেন। Ode to Progress of Poesy তারই নিদর্শন। Thomas Warton (১৭৭৪—৮১) ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস (History of Poetry) লিখেছিলেন। কাব্য রসিকেরা Chaucer এর সঙ্গে বেশ পরিচিত হ'তে আরম্ভ করলেন। Thomas Hammer and Warburson এর sheobald, are এবং সংস্করণ সমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর ১৭৬৫ খৃঃ Johnson এর Shakespeare এর সংস্করণ প্রকাশিত হয়। Garik আবার Shakespeare এর নাটক সমূহের খাঁটি text (মূল রচনা) পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পেতে লাগলেন। কতক গুলি কাব্য রসিক Spenser এর প্রতিভ অনুকরণ করে কবিতা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা পেতে লাগলেন। Thomas Warson Spenser এর fairy queen সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। William Shenstone এর the School Mistress (১৭৪২) ও Thomson এর সুখ পাঠ্য castle of Indalence. John Seahio the minstul এ সব স্পেনসারীর ধরণের কবিতা।

Dr. Percy the Religne's of Ancient English Poetry প্রকাশিত হওয়ার

অতীতের রহস্য জানবার জন্য কাব্য রসিকদের ব্যগ্রতা দেখা দিল। অতীতের অদ্ভুত কাহিনী, গাথা ইত্যাদি পরবর্ত্তী যুগের বিপুল প্রাণ কবি Sir Walter এর হাতে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছিল। The Braes of yanon এবং mavet এর William and margeret (১৭২৫ খৃঃ অঃ) পূর্ব্বেই রচিত হয়েছিল। কাব্য রসিকগণ ইতিহাসের অসভ্য যুগের মানব জীবনের অমার্জ্জিত আড়ম্বর ও কৃত্রিমতা বিবর্জ্জিত সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনাবলীর দিকে আকৃষ্ট হ'তে লাগলেন। লোক লোচনের অন্তরালের নগ্ন হিংস্র বর্ব্বরতার দৃশ্যের মোহ এবং এসবে কবির আনন্দও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। Grayর the Norse legend এবং Macherson এর জাল কবিতা মালা The Ossian এবং বালক কবি Chatterton এর জাল কবিতা The death of Sir Charles Baldwin এবং অন্যান্য কবিতা এর যথেষ্ট প্রমাণ অদ্ভুত বানান ও নূতন ঢংএর ছন্দোবন্ধে রচিত চ্যাটারটনের এই কবিতা সমূহ কাব্য জগতে একটী আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৭ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হয়ে এই বালক কবির কবিতা সমূহের আদর যোগ্যতাকে অতিক্রম করেছে। কিন্তু তার কবিতা সমূহের সহিত রোমান্টিক অতীতের স্মৃতি বিজড়িত বলেই এত আদর।

রচনা ভঙ্গী বা ভাষা

Elezabeth এর যুগের কবিদের সরল ভাষা পরবর্ত্তী যুগে তেমন আদৃত হয় নাই। তাই পরে Pope ও Dryden পন্থী সমালোচক কবিগণ অনুভূতিকে বাদ দিয়ে বুদ্ধির অনুমোদিত কতক গুলি বিধি পালন করেই আর্টের সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ভাষায় জীবনের সাড়া ও উত্তাপের অভাব এবং এ গুলির অভাবে আর্ট খর্ব্ব হয়েছিল। যদিও এই সময়ের কবিগণ বেশ কুশলী। যা হ'ক ক্রমে স্বভাব ও আর্টের সামঞ্জস্য আরম্ভ হয় এবং Cowper এর গীত সমূহে যেমন Lines to Mary Unwin এবং The cas wayতে বেদনার এমন সহজ সরল অথচ অতলস্পর্শী গভীরতার সাক্ষাৎ পাই যার ভাষা গ্রীক বিষাদ নীতির ন্যায় সহজ ও সুন্দর। এখন আর্টের সঙ্গে স্বভাবের সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে, কিন্তু ১৭৮২ খ্রীঃ অঃ Robert Burns এর কবিতা সমূহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কাব্য সাহিত্যে অনুভূতির প্রখরতা এবং অনুরাগের গাঢ়তা সম্যক্ প্রবেশ লাভ করে নাই।

কবিতা প্রসঙ্গ কবিগণ সাধারণতঃ দুইটী বিষয়ে কবিতা লেখেন—মানব ও প্রকৃতি। Pope এর যুগ পর্য্যন্ত মানব জীবনই কবিতার প্রধান প্রসঙ্গ ছিল। আকাশ, বাতাস, জল প্রভৃতির সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ ক্রমে কবিতা সাহিত্যে স্থান অধিকার করে ব'সল। এর পরে প্রকৃতি কবিতার একটী স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে প'ড়ল।

গ্রাম্য দৃশ্যাবলী বর্ণনে কবিহৃদয় বিশেষ ক'রে গীতি কবিগণের হৃদয় নেচে উঠত; কিন্তু Shakespeare, Marvel, Milton, Vaughan Harrick প্রভৃতি কবিগণের রচনায় প্রকৃতি শুধু প্রসঙ্গ ক্রমে আনয়ন করা হয়েছে। Pope এর জীবিতাবস্থায়ই (১৭২৬—৩০)

Thomson এর The season প্রকাশিত হয়। এইটিতে প্রথম প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। এই কবিতায় বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত এই চারি ঋতুর বর্ণনা এবং গ্রাম্য জীবনের ছবি আঁকা হ'য়েছে। Thomson এর কবিতা প্রকাশ হওয়ায় কাব্য রসিকগণের দৃষ্টি গ্রাম্য দৃশ্যাবলীর দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁরা সহর থেকে গ্রামে গিয়ে তথাকার নয়ন তৃপ্তিকর দৃশ্যাবলী দেখে হৃদয়ে যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন তাই কবিতায় ব্যক্ত করতে সুরু করলেন। Dyer Grongar Hill (১৭১৬) এর Fleece (১৭৫০) এইরূপ কবিতার নমুনা। দেশ বিদেশ ভ্রমণের ফলে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হ'তে থাকে এবং ইংলণ্ড ভূমির বন, জঙ্গল ও বন্য স্থান সমূহ পরিদর্শনের জন্য এক অভিনব ব্যগ্রতা দেখা দিল। Gray এর পত্র সমূহে Yorkshirere ও Westmoreland Shire এর দেশ চিত্র চমৎকার সূক্ষ্মভাবে লিখিত হয়েছে। এ গুলি ইংরাজী সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ এবং অভিনব ব্যাপার। কিন্তু প্রাকৃতিক বর্ণনা Graya কবিতার ভূষণ মাত্র, প্রাকৃতিক বর্ণনা কবিতার বিষয় নহে। মানব জীবনের সম্বন্ধে নানা কথা এবং নৈতিক উপদেশ এই সব কবিতায় রয়েছে। Collins এর Ode on the Passions এবং Ode to Evening ও এই ধরণের কবিতা। এখন পর্য্যন্ত প্রকৃতির প্রতি প্রকৃত অনুরাগ জন্মে নাই। Gold smith's Traveller (১৭৬৪) এবং Deserted village (১৭৭০ খৃঃ) সম্বন্ধে আর একটু অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য প্রকৃতির বর্ণনায় Collins এর কবিতায় যে আবেগ দেখা যায় এখানে সে আবেগ নাই বটে কিন্তু Goldsmith এ নৈতিক উপদেশ একটু কম। যে সব দৃশ্য তিনি চিত্রিত করেছেন সে গুলি কেবলই চিত্র মাত্র—তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। এর পর Warton নামক কবিদ্বয় আরও একটু অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের কবিতায় দেখা যায় যে তাঁদের নিজেদের অনুভূতি গুলি বন জঙ্গল, নদী, নালার মধ্যে তারা প্রতিফলিত দেখছেন এবং এই নির্জ্জন প্রকৃতির মধ্যে আত্ম জ্ঞান বিশিষ্ট আনন্দ ক্রমে কবিতার প্রধান বিষয় হয়ে পড়ল। ক্রমে Cowper এর পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি নিজস্ব গাঢ় অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায়। James Butt's The minstrel (১৭৭১)এ এর বেশ আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। কেবল মাত্র প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত এক যুবক কবি কেমন করে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছিল, এই কবিতায় তারই একটী চিত্র আঁকা হ'য়েছে। ভুবনবিখ্যাত তাপস কবি Wordsworth তার Prelude এ প্রকৃতির কাছে তিনি কেমন করে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনার সঙ্গে এই কবিতার বর্ণনার খুব মিল।

এই সময়ে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানবের কল্যাণের দিকে কবির হৃদয় আকৃষ্ট হয়। প্রথমে কবিগণ ইংলণ্ডের বাহিরের অন্যান্য জাতীয় মানবের কল্যাণ সম্বন্ধে তা'তে বেশ আনন্দ পেতে লাগলেন। আর এক দিকে দীন দরিদ্র মানব জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতি কবির প্রাণে অনুভূত হ'তে থাকে। মক্কার তীর্থ যাত্রী এবং সাইবেরিয়ার নির্ব্বাসিত পুরুষের

প্রতি Thomson এর যথেষ্ট সহানুভূতি দেখতে পাওয়া যায়। Goldsmith এর Traveller ও দেশ বিদেশের নানারূপ কঠিন সমস্যার মীমাংসার জন্য ব্যগ্র। Goldsmith এর Deserted village, Shenstone এর School mistress এবং Grayর Elegy এ সব দীন দুঃখীদেরই ইতিহাস। Michael Bruce তাঁর Lochheven এ গ্রাম্য জীবনের Secret Primrose path এর কথা বর্ণনা করেছেন এবং Dr. John Langhourne তাঁর country Justice এ গরীব দুঃখীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং তাদেরই দুঃখময় জীবনের চিত্র আঁকতে চেষ্টা পেয়েছেন আর এই সঙ্গে Shenstone এর Jemmy Dawson, Marner's Wife এবং Gold smith এর Edwin and Angelina এই কয়েকটী কবিতার উল্লেখ করা উচিত। এই সমস্তে দেখতে পাই এই সব গরীবদের সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর প্রেম কাহিনী। এই সমস্ত গীতি গাথা রোমাণ্টিক যুগের মুকুট স্বরূপ। এসব Wordworth এর Lyrical ballads এ পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। এই সময়ে স্কটল্যণ্ডের কয়েক জন কবিও এই ধরণের কবিতা লিখেছিলেন। Pope, Grayর বন্ধু Allan Ramsay গ্রাম্য নাটক the gentle Shepherd এ গরীব দুঃখী চাষী ও রাখালগণের প্রেমের চিত্র নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করেছেন। Burns এর কবিপ্রতিভা বিকাশের মূলে যে Robert Fterguson; তিনি কতক গুলি গ্রাম্য শিষ্টাচার বর্জ্জিত মোটা অসভ্য জীবনের কৌতুক চিত্র অঙ্কিত করেছেন। yarrow poems এ auld Robin Grayতে এবং the lamut for to dden এ Scot land এর প্রিয় সহচর গাথা সাহিত্য কিছু আধুনিক ভাব ধারণ করলেও তারা যে অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী ভাবে রচিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। Yarrow poems এ auld Robin Gray তে এবং the lament for Elodden.

যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ও নূতন উপাদান সমূহের কথা এখন বলা হয়েছে, এ গুলি কবির ভিতর স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, তাঁদের নাম Cowper Crabbe এবং Burns এই সব কবিগণের কথা আলোচনা করার পূর্ব্বে কবি শিল্পী Blake এর কবিতা সমূহের কথা তিনটী কারণে উল্লেখ করা উচিত প্রথমতঃ রোমাণ্টিক যুগের নূতন উপাদান সমূহ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। ১৭৭৭ সালে লিখিত The Poetical Sketches দ্বারা বুঝা যাচ্ছে Elezabeth এর যুগের কবিগণের আদর এবং তাদের কবিতার চর্চ্চা কতখানি বেড়েছে। এক দিকে Blake যেমন Spencer এর অনুকরণ করেছিলেন আর এক দিকে তাঁর Edward III নামক সংক্ষিপ্ত খণ্ড নাটকে Marlowe র প্রচণ্ড উত্তেজনা ও উগ্র কল্পনার সন্ধান পাওয়া যায়। Blake এর The muses নামক ছোট্ট কবিতাটীতে পুরাতন ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের কবিগণের কবিজনোচিত গাঢ় অনুরাগ বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার পুনরুদ্ধার হওয়া দরকার এই সম্বন্ধে একটী সকরুণ ক্রন্দন। কতক গুলি গাথা গীতিতেও Mopperson এর ossian এবং Percyর the Reliques এ পুরাতনের প্রতি যে গাঢ় অনুরাগ সৃষ্টি করেছিল তারই পরিচয় আমরা পাই

দ্বিতীয়তঃ শুধু মানবপ্রীতি নয়, প্রাণী (জীব জন্তু প্রীতি) love of animals, শিশুর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এবং গৃহ সম্বন্ধে কবিতা এ সমস্ত রোমান্টিক যুগের উপাদান সমূহের মধ্যে। Blake এর কবিতায় এ সবই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনের সহজ সরল কবিতা ১৭৯৮ সালে wordsworth এর Lyricalballad এ যে উৎকর্ষ লাভ করেছিল যথাক্রমে ১৭৮৯ ও ১৭৯৪ সালে লিখিত Blake এর songs of Iunocence এবং Experience এ তার পূর্ব্বাস্বাদ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ডিমক্রাটিক ভাব, কুটিল যাজকতার প্রতি ঘৃণা এবং সামাজিক গলদ সমূহের বিরুদ্ধে চীৎকার তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। Blake তখন একজন সম্পূর্ণ Mystic এবং তাঁর এই mysticism এর মধ্যে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে এবং frur theology সম্বন্ধে যে সন্ধান পরতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। Ramantic যুগের পরবর্ত্তী যুগের কবিতার এই সন্ধান পরতাই একটি বিশেষ গুণ।

তৃতীয়তঃ তাঁর গানে এলিজাবেথিয়ান কবিগণের ভাব, ভাষা, পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। Songs of Inocence এর ছোট ছোট কবিতাগুলি এত সহজ, সরল ও মধুর যে সমগ্র ইংরাজি ভাষার সাহিত্যে এ সবের সমকক্ষ কবিতার সন্ধান পাওয়া দায়। শিশু (Infancy) প্রথম মাতৃত্ব The first motherhood এবং The Lamb নামক কবিতাগুলি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। যা হ'ক এলিজাবেথীয় গীতি কাব্যের পুনরুদ্ধার এবং Wordsworth এর নীতি কাব্যের আভাস উভয়ই Blake এর মধ্যে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মপ্রাণ Cowper এর অন্যান্য গুণ সমূহের মধ্যে এখানে কয়েকটী বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। Cowper র Jchn Gilpin নামক কবিতা বেশ একটু নূতন ধরনের। পরবর্ত্তী কবিগণ এ ধরণের কবিতাও কিছু কিছু লিখেছেন কিন্তু উল্লিখিত কবিতায় যে হাস্য রসের ভাব পরিলখিত হয় তার সঙ্গে cowpor এর রচনায় একটী সহজ সরল কল্পনার জড়িত। এ বিষয়ে cowper একজন বিখ্যাত শিল্পী তাঁর Lines to mary umuri এবং 'mothers picture এর প্রতি কবিতা পাঠ ক'রলে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় আড়ম্বর বিমুক্ত, বিশুদ্ধ স্বাভাবিক ভাব ইংরাজী গানের রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ ছাড়া Blake ও Cowper উভয়ই (Love of animal) জীব প্রেম এবং 'জীবের সঙ্গে মানবের সঙ্গে সম্বন্ধ' সম্বন্ধে যে নূতন ভাব কবিতা সাহিত্যে ফুটাইয়াছিলেন তার সুরে পরবর্ত্তী কবিগণের বীণা বেজে উঠেছিল। Cowper এর সর্ব্ব প্রধান রচনা the task ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় আমরা তাঁর নিজের জীবনের একটী বর্ণনা পাঠ করি, সঙ্গে সঙ্গে অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনের ছবি, তাঁর গৃহের বর্ণনা, তার বন্ধু, তাঁর চিন্তারাজি, olney র নিভৃত শান্তিময় দৃশ্যাবলী, আশে পাশের গরীব দুঃখীদের কথা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক তত্ত্ব সমুহ এবং সর্ব্বশেষে ভগবানের জয়ের কথা দেখতে পাই। এখানে যে পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে সে অতি বড় পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির প্রতি কবির দৃষ্টি বদলে গেছে। প্রকৃতিই কবিতার একটী স্বতন্ত্র

বিষয় এবং প্রকৃতির প্রতি Cowper এর যে অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সে অনুরাগ, স্বাধীন এবং পরিবর্ত্তনও খুব বড়। সমগ্র মানব জাতিকে এক ক'রে দেখতে কবিরা যে চেষ্টা করেছিলেন, Cowper এর মনে সেই ভাবটা পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। পরবর্ত্তী কবিগণ এই ভাবের উজ্জ্বলতা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন বটে কিন্তু cowper এ সম্বন্ধে সকলেরই অগ্রণী তারই ভাবরাজি পরবর্ত্তী কবিগণের বীণার তারে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

Cowper এর মত George Crabbe মানব সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছিলেন। The village এবং The Parish Register এ দীন দুঃখীদের ত্যাগ স্বীকার, তাদের প্রলোভন সমূহ, প্রেম, অপরাধ, পাপ ইত্যাদির গ্রাম্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই সমস্ত কবিতা পাঠ করলে পাঠকের মানব প্রীতি যে বর্দ্ধিত হবে তাতে কোন সন্দেহই নাই। গরীব চর্ম্মকার কবি Robert Bloomfield ও এই ধরণের কবিতা রচনা করেছে। Bloom field এর কবিতা সমূহ Crabbe এর কবিতা অপেক্ষা অনেক খানি আনন্দদায়ক। Crabbe একটু কঠোরতা প্রিয় কিন্তু উভয়ের প্রাকৃতক সৌন্দয্য বর্ণনায় বেশ সত্য প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আর এক ধরণের কবিতা যা রোমান্টিক যুগের অন্যতম উপদান Restoration এর ইংরাজি কাব্য সাহিত্যে আর দেখা যায়নি। Robert Burns কতকগুলি উত্তেজনাময় প্রেমের কবিতা লিখে এই অভাব দূর করেন। Elizabeth এর যুগে যে সুর সমস্ত জগতকে মুগ্ধ করেছিল Robert Burns এর কবিতায় সেই সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে। বরং Burns এর সুর বেশী পরিস্কার সহজ অথচ সরল এবং স্বাভাবিক। প্রেমের কবিতা দিয়েই Burns এর কাব্য জীবন আরম্ভ হয়েছিল। ১৭৮৬ খ্রীঃ তাঁর কবিতার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি শুধু প্রেমের কবি নন। মানব সম্বন্ধে যে সমস্ত নূতন দৃষ্টি জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল Burns সেই দৃষ্টি নিয়ে বহু কবিতা লিখিয়াছেন। নিজে দরিদ্র তাই দরিদ্রের গান তিনি গেয়েছেন। Crable ও Cowper ইংলণ্ডে বসে গরীব দুঃখীদের দুঃখের চিত্র আঁকতে চেষ্টা পেয়েছিলেন। Burns ও স্কট্‌ল্যাণ্ডে ঐরূপ চেষ্টাই করেছিলেন; জীবে দয়াও—Burns এর কবিতার অন্যতম বিষয়। The Revolution : এই প্রসঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের কথা একটু দরকার। কয়েক শতাব্দী যাবৎ ইউরোপ মহাদেশ খণ্ডে সমগ্র মানব জাতিকে এক করে দেখার জন্য মানুষের মনে যে সব ভাবের উদয় হয়েছিল, Cowper, Crable এবং Burns লিখিত কবিতায় আমরা তার পরিচয় পাই। এই সমস্ত ভাবের মর্ম্ম এই যে মানুষকে কৃত্রিমতা বর্জ্জিত নগ্ন স্বভাবিক জীবনকে পুনরায় বরণ করে নিতে হবে। সহরের অস্বাভাবিকতা পীড়িত জীবন অপেক্ষা গ্রামের শান্ত এবং সহজ জীবন অনেক সুন্দর। তাই গ্রামের দৃশ্যাবলী এবং দীন দুঃখীদের জীবন চিত্র কবিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয় হয়ে পড়ল। এই প্রসঙ্গে আবার মানবের স্বাভাবিক অধিকারের কথা উত্থাপন করা হয়। সকল মানুষেরই সমান অধিকার তাই সমগ্র মানব মিলে একটি মাত্র জাতি। সকল মানুষ সমান, ভাই ভাই এবং সকলেই স্বাধীন। সুতরাং মানবের টীকএমাত্র শ্রেণী, মানব শ্রেণী এবং একটা মাত্র জাতি, মানব জাতি। প্রত্যেক মানুষই এই

সমগ্র মানব জাতির একজন ও তুল্য অধিকারী। ধন সম্পত্তি পদ মর্যাদা জাতি এবং বর্ণ বিভাগ নিতান্ত গর্হিত ও অন্যায় বলে পরিত্যাজ্য। এই সব ভাব অবশ্য নূতন নয়। রিনাসান্স যুগ হতে এ সব চলে এসেছে। কি ধর্ম্ম কি রাজ নীতি, কি সমাজনীতি সকল বিষয়েই মুক্তির জন্য রিনাসান্সে যে ব্যগ্রতা দেখা দিয়েছিল তাই এই ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে প্রকট হয়ে উঠল। কোন কিছু গড়া ব্যাপারে ফ্রান্সই ইউরোপের মধ্যে অগ্রণী। ফরাসী সাহিত্যে সর্ব্বদা সব মানুষ সমান, মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই এবং তারা সকলেই স্বাধীন ইত্যাদি কথা লিখিত ও পঠিত হত। এখন ফলেও পরিচয় পাওয়া গেল ১৭৮৯ খৃঃ Bastile এর ধ্বংশ সাধনে এবং পরবর্ত্তী যুগের নূতন Constitution এর ঘোষণা দ্বারা। এ সব আন্দোলনে ইংলণ্ডে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল তাই নিয়েই Romantic যুগের কবিগণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের কবি প্রতিভার খোরাক এখান থেকেই সংগ্রহ হয়েছিল। Wordsworth, Southe এবং Coleridge এই তিন জন কবির হৃদয় প্রথমটা এই সমস্ত আন্দোলনে আনন্দে নেচে উঠেছিল কিন্তু অচিরেই the Reign of terror এর অত্যাচার ও অনাচার এবং Nepoleon এর সম্রাটজনোচিত প্রভুত্ব দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং পিছে হঠে যেতে বাধ্য হলেন। স্কট মর্ম্ম বেদনা বিপ্লব কারিগণ যে অতীতকে ধ্বংশ করতে চেয়েছিল সেই সুন্দর রহস্যময় Romantic অতীতের সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ করলেন। Byron বিপ্লববাদীদের সঙ্গে পুরোপুরী একমত না হলেও সামাজিক সংস্কারের প্রচলিত রুচির বিরুদ্ধে বিপ্লব বাদীদের মূল মন্ত্র কেমন করে কার্য্যকরী হয়েছিল, তাহা তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন। Shelly ও বিপ্লব বাদীদের পক্ষই সমর্থন করেছেন কিন্তু সে বিপ্লব বাদীদের বিরুদ্ধের যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সে প্রতিক্রিয়া যখন থেমে গিয়েছিল তার পর। অবশ্য Romantic যুগের আর দুই জন কবি Rogers এবং Keats বিপ্লব বাদীদের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখেন নাই। এদের রচনায় একটী নূতন সুর বেজে উঠেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সে সুর। এ দুজন পরম দরদী কবির রচনায় যে বেদনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাতে মানুষের মনে এক নূতন আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং প্রকৃতির (সৌন্দর্য্য) এক নূতন আলোতে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। Lowell বলেছেন "Keats influenced the forms of succeding poets."

স্থাপত্য চর্চ্চায় মুসলমান।

(আবদুল মজীদ চৌধুরী বি. এ)

আদিম যুগে মানুষ যখন শীতগ্রীষ্মের অত্যাচার হতে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় উদ্ভাবন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সেই কাল হতে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মের সভ্যতার অনুযায়ী মানুষ তার আবাস গৃহ নির্ম্মাণ-কৌশল উন্নত করতে চেষ্টা করেছে। আবাস গৃহ হতে ক্রমে উপাসনাগৃহ, মিলনগৃহ পাঠাগার ইত্যাদি ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যা প্রয়োজন হয়েছে তা স্থায়ীরূপ পেয়েছে স্থাপত্য শিল্পে। Aesthetic sense বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার স্থাপত্য শিল্পকে, দালান এমারতগুলিকে নানা রকম কারুকার্য্য ও নির্ম্মাণ নৈপুণ্যে মনোরম করে নিতে চেষ্টা করেছে। এই নির্ম্মান নৈপুণ্যে যে জাতি যত খানি দক্ষতা দেখাতে পেরেছে তাঁরা স্থাপত্য শিল্পে ততখানি উন্নত বলে স্বীকৃত হয়ে গেছে। নির্ম্মাণ নৈপুণ্যের দিক দিয়া, ইটপাথরের মধ্যে চিক্কণ অথচ জটিল কারুকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার দিক দিয়া মুসলমান কতখানি উন্নতিলাভ করেছিল তাহা দেখানই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

Moslem archiecture বা মুসলমান স্থাপত্য বলতে কি বুঝতে হবে তা প্রথম দেখা উচিত। Russel, History of archiecture এ লিখেছেন "The arobs ware teae somites and as duch ware not a sace of original thaughe in builonig" অর্থাৎ অরবেরা প্রকৃত সেমিটিক ছিল তাই বলে স্থাপত্য বিদ্যায় তাদের জাতিগত নিজস্ব কোন মৌলিকতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানেরা যে দেশে গিয়েছে সেই দেশের তখনকার স্থাপত্যশিল্পের ধারাকে নিজের আদর্শ ভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তনে তার নূতন পথে পরিচালিত করেছে। স্থাপত্যশিল্পে মুসলমানদের গৌরব সৌন্দর্য্যরচনা ও কারুকার্য্য নিজেদের নির্ম্মাণ কৌশলের চরম উৎকর্ষতার দিক দিয়া। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের পর মুসলমান প্রাধান্যের যুগে মরুময় আফ্রিকা হতে পারস্যের সীমারেখা পর্য্যন্ত নূতন যুগের যে শিল্প art পরিপুষ্টতা লাভ করে তা আগের যুগের শিল্পই নূতন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়ে আসে। এ যুগে প্রধানতঃ বাইজেনটাইন শিল্পকে (Byzantine art) আদর্শ করা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ধর্ম্মগত ও জাতিগত বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী বাইজেন্টাইন ও পারস্যের শিল্পের সংশোধন করে নেওয়া হয়েছিল। প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমান আধিপত্য স্থাপত্যের যে উন্নতি হয়েছিল তাতে মুসলমানেরা কারুকার্য্য পুরাতন নমুনার (design) কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন নাই। কিন্তু অন্যদিকে এই সময়ে রোমানরাজ্যে বাইজেন্টাইন শিল্পের যথেচ্ছা উন্নতির চেষ্টা হয়েছিল এবং সৌন্দর্য্যরচনায় তাঁর নানা রকম পরিবর্ত্তন সংগঠিত করেছিল। এর পর যুগে স্পেন, পারস্য ও ভারতের স্থাপত্যে

মুসলমানেরা সৌন্দর্য্যরচনায় (decoratire design) এক অভিনব পরিবর্ত্তন আনয়ন করেছিল। মুসলমান স্থাপত্যের বিষয় বলতে গেলে বিভিন্নদেশের বিভিন্ন ধরণের স্থাপত্য মুসলমান কি করে নিজের আদর্শ ও প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে নিয়েছে তার ধারাবাহিক বর্ণনা দিতে হয়। কিন্তু এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মুসলমান স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া নহে, এখানে শুধু মুসলমান স্থপত্যের বিষয় মোটামোটি একটি ধারণা সৃষ্ট করে এই বিচারের বিশদভাবে আলোচনায় সুচনা করাই উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন দেশের স্থাপত্য বিভায় প্রয়োজন ও আদর্শগত পরিবর্ত্তন করে মুসলমান তাঁর নিজের একটি বিশেষ Style বা ধরণের সৃষ্টি করেছিল। এই ধরণকে সাধারনতঃ Saracenic style বলা হয়। Stalactite vaulting বা ইটপথের ছাড়া ছাদ এই ধরণের প্রধান বিশিষ্ট অঙ্গ। মুসলমান স্থাপত্যের এই বিশিষ্টতা স্পেনের পশ্চিম সীমা হতে ভারতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমান স্থাপত্যকে এক বিশেষরূপ দান করেছে। খলিফা হারুন অল রশিদের পত্নী জুবেদার সমধিতে ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে এই বিশেষত্ব প্রথম দৃষ্ট হয়। এই বিশিষ্টতা ছাড়া Pointed arch কোনাকৃতি খিলান Horse shoe arch বা অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলান দেওয়ালগাত্রে ও মারবলে সাজান কাজ মুসলমান ধরণ বা style এর বিশেষত্ব।

মুসলমানদের সাধারণ এমারত হতে মসজিদগুলাকে এক বিশেষ্টরূপ দেওয়া হয়েছে। মিহরাব, মিম্বর, মিনার, গুম্বজ, মকসুরা arch বা ও লিওয়ানের মসজিদের অবিচ্ছেত্ত অঙ্গ হিসাবে সৃষ্ট করে এই পার্থক্য করা হয়েছে। প্রথমে সামাণ্ড কোন চিহ্ন দিয়ে কাবার দিক নির্ণয় করা হত, অনেক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে ক্রমে মিহরাবের বর্ত্তমান রূপ হয়েছে। মদিনার মসজিদে হজরত প্রথম দাঁড়াইয়েই ওয়াজ করতেন, পরে তিন শিড়ির এক খানা কাঠের আসন তৈরী করে উপরে বসে ওয়াজ করতেন। নীচের দুই শিড়িতে আবুবকর ও ওমর বসতেন। এই আসনের অনুকরণে মিম্বর তৈরী হয়। এবং মসজিদের একটি বিশেষ অঙ্গ বলে গৃহীত হয়। মদিনার প্রথম মসজিদে কোন মিনার ছিল না। মোয়াজ্জিন (অগ্রদূত) "বিলাল" একটি স্তুপের উপর হতে বিশ্বাসিদিগকে প্রার্থনার জন্য আহ্বান করতেন। মুসলমানদের রাজ্যজয়ের সঙ্গে জাঁকজমকের দিকে তাঁদের মন আকৃষ্ট হয় ও আজান দেওয়ার জন্য মিনার তৈরী হয়।

মদিনার প্রথম মসজিদে গুম্বজ ছিল না। গুম্বজ সৃষ্টির ধারণা মুসলমানরা কোথা হতে পেয়েছিলেন তা বলা কঠিন। Saracenic archiecture এর উন্নতির যুগে মেশপটমিয়ার এমারত হতে গুম্বজের plan গ্রহণ করা হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। শিরিয়া মেসপটমিয়া ও ইজিপ্ট হতে arch এর নমুনা গ্রহণ করা হয়েছিল। খৃষ্টীয়ান গীর্জ্জাগুলি হতে 'লিওয়ানের' ও মকসুরার প্রচলন করা হয়। মসজিদের ভেতর বেড়া দিয়ে আলাদা করে রাখা জায়গার নাম মকশুরা। ভারতের মশজিদগুলিতে ইহার প্রচলন দেখা যায় না।

নিজ ব্যবহারের জন্ত নির্ম্মিত মদিনার বর্ত্তমান মুশজিদ আরব মরুর পয়গম্বরের প্রথম

স্থাপত্য। উপাসনালয় হিসাবে হজরত ইব্রাহিমের মসজিদের উপর স্থাপিত কাবাই মুসলমানদের প্রথম এমারত। Tuckerman লিখিয়াছেন "The Kaaba has less importance as an architecitural production than as the centre of the wheel of Mohamenism." মুসলমান জগতে কাবার ধর্ম্মগত বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকলেও স্থাপত্য হিসাবে কাবার কোন বিশিষ্ঠতা নাই। মসজিদ নির্ম্মান বিষয়ে কোন ধর্ম্মগত আদেশ না থাকাতে মুসলমানদিগকে রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজন মত বিজিতদেশের স্থাপত্য শিল্পের পরিবর্ত্তন করে নিতে হয়েছিল। কোন কোন স্থলে মুসলমানেরা অন্য জাতীর উপাসনা গৃহের সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন করে তথা মেহরাব তৈরী করে ও আনুসঙ্গিক পরিবর্ত্তন সাধন করে তাহা মসজিদে পরিণত করে নিয়েছিল। হজরতের নির্ম্মিত মদিনার মসজিদের যে কোন স্থানেই অনুকরণ করা হয় নাই তাহা নহে, সাদ বিন আবু আব্বাস দ্বারা নির্ম্মিত কুফার সুবৃহৎ মসজিদে পারস্যের ধরণের অনুকরণ করা হলেও কুফার দ্বিতীয় মসজিদে মদিনার মসজিদকেই আদর্শ করা হয়েছিল প্রধানতঃ বাইজেনটাইন গ্রীক ও রোমান ধরণ বা styles এর অনুকরণ করে "মুসলমানেরা নিজেদের ধরণের (style) সৃষ্টি করেছিলেন। তুর্কী, এশিয়া মাইনর ও পারস্যের মসজিদগুলির ও বাইজেটাইন গীর্জ্জাগুলির মধ্যে অনেক স্থলে সমন্বয় দেখা যায়। কনষ্টানটিনেপলের প্রায় সব মসজিদগুলিই st. sophia র অনুকরণে নির্ম্মিত।

প্রথম যুগের মুসলমান স্থাপত্যের প্রধাণতঃ চারটি ভাগ করা যায়। যথা: শিরিয়াণ মিশরীয়, পারশিক ও নর্থ আফ্রিকান, হিসপানো-মুরিস।

শিরিয়ায় মুসলমান স্থাপত্যের প্রধান কীর্ত্তি জেরুজালেমের কুব্বত উছ ছখরা (dome of the rock) নামীয় খলিফা ওমরের নির্ম্মিত মসজিদ, দামেস্কে ওলিদের মসজিদ ইত্যাদিতে রোমানো-পারশিক ধরণের (style) পুরাপুরি অনুরণ করা হয়েছে। এই মসজিদগুলির স্তম্ভের নমুনা (clonmrs) রোমান ও গ্রীক উপাসনালয় হতে গ্রহণ করা হয়েছিল। খলিফা ওলিদ st. Jhon the Baptist এর গীর্জ্জার উপর যে মসজিদ নির্ম্মান করেন তাতে তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট জানটিয়ান প্রেরিত সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেন। মসজিদগুলিতে অন্য ধরণের (style) অনুকরণ করলেও শিরিয়ান মুসলমানরা স্থাপত্য বিদ্যায় এতই পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন যে কারবালার মসজিদেদের মিনার তৈরীতে তাঁহা যে নির্ম্মাণ কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন তাহা ইউরোপে একেবারেই বিরল।

মিশরীয় মসজিদগুলির plan বা পরিকল্পনায় আমরা একটি বিশেষত্ব দেখতে পাই। প্রায় মসজিদেই প্রধাণতঃ একটি প্রাঙ্গন, মোসাফিরদের জন্য গৃহ, গোসলখানা ও উটের আস্তাবল সংলগ্ন আছে এবং আরবি সোনালি অক্ষরে সমস্ত মসজিদগুলিই সাজান। কায়রোর মসজিদ গুলিতে Horse shoe arch বা অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলাণ এর খুব ব্যবহার দেখা যায়। এখানে আমরুর ইবন অল আছ এর মসজিদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রথমে Horse shoe arch এর যে সব মসজিদে ব্যবহার করা হয় তন্মধ্যে আবুতুলুনের সুসজ্জিত মসজিদ অন্যতম। Four centred

arch বা একটি প্রাথমিক নমুনা কারুকার্য্য ও সুচিক্কন সৌন্দর্য্য রচনার জন্য অতুলনীয় মালেক এল ছালেহর মসজিদে দেখা যায়। এখন এই মসজিদটি পারিবারিক আবাসে পরিণত করা হয়েছে। কায়রোর মুয়ায়াদের মসজিদের কারুকার্য্য ও আল বেরকুনির মসজিদের মারবলের জোড়া এতই উন্নত ধরণের যে তাহা মিশরে মুসলমান স্থাপত্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠার প্রমান দেয়। কায়রোর বাহিরে বেবারের সুনির্ম্মিত মসজিদ stalactite decoratisn

এ　ও কয়তবের সুদৃশ্য সমাধি মসজিদের গুম্বজ সাজান কাজে মুসলমানদের নিপুণতার নিদর্শন। এই সময় মুসলমানরা অঙ্গনের কাজে, marble (মার্ব্বল) পাথরের সুনিপুণ কাজে ও পাথরের লেস দিয়ে রচনায় বিশেষ পারদর্শী হয়েছিলেন। কায়রোর সুপ্রসিদ্ধ আল আজহার ও আক্তর এ নবী মসজিদের স্তম্ভের নমুনা গ্রীক এবং রোমান উপাসনালয় হতে গ্রহণ করা হয়েছে। আল আজহারের স্থাপত্য হিসাবে এখন কোন বিশেষত্ব নাই।

৬৫৫ খৃঃ হতে ৬৮৫ খৃঃ মধ্যে আরবেরা উত্তর আফ্রিকা অধিকার করেন। উত্তর আফ্রিকার ভৌগলিক অবস্থিতি, বাইজেনটাইন পুনরাধিকার ও মরুভূমির সম্প্রদায়গণের সাথে সীমান্তের যুদ্ধবিগ্রহের জন্য খুব শীঘ্র এখানে মুসলমানের কোন ধরণ (style) সৃষ্টি হয় নাই। ৭১০ খ্রীঃ হতে স্পেন বিজয় আরম্ভ হয় এবং ইহার ৫০ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রকৃত মোসলেম ধরণের (style) সৃষ্টি হয়। করডুবার সুবৃহৎ মসজিদে এই ধরণের পূর্ণতা দেখা যায়! পশ্চিমে মুসলমানদের কেন্দ্র সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে করডোর মসজিদ স্থাপিত হয়। এই মসজিদ যাতে স্পেনে স্থাপত্যে হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে তার জন্য মুসমানেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মুরপাণ এ সময়ে স্থাপত্য বিদ্যায় এক অভিনব উন্নতি আনয়ন করেন। সেভিলিতে আল কাজার, গ্রানাডাতে আল হামরা প্রাসাদ তাঁদের শিল্পকার্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। Tuckerman লিখেছেন 'They... show in their design and ornament the most fertile expenion of the brilliant imagination with which these worm glooded people impued all its creation আলহামরা ও জারাগাজার ভগ্ন মসজিদ ব্যতীত স্পেনে মুসলমান স্থাপত্যের আর বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। যে সকল মসজিদ এখন গীর্জ্জাতে পরিণত করা হয়েছে তার এতই পরিবর্ত্তন করা হয়েছে যে তাতে আর মুসলমানের বিশেষত্বের কোন নিদর্শণ পাওয়া যায় না। মোসলেম নির্ব্বাসনের পর এখনও সিছিলি, ইটালি ও স্পেনে মুসলেম স্থাপত্যের প্রাধান্যের নমুনা পাওয়া যায়। ছিছিলির st. cataldo ইত্যাদি কয়েকটি গীর্জ্জাতে saracenic style এর অনুকরণ করা হয়েছে। ইটালি ও স্পেনে Horse shoe arch এর খুব প্রচলন দেখা যায়।

৬৪২ খৃঃ পারস্য জয় করা হয়। রোমানদের পর স্থাপত্যশিল্পে বিশিষ্টতা লাভ করেছে এমন একটি জাতী এখানেই প্রথম মুসলেম-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এখানে মুসলমানদের, স্থানীয় স্থাপত্যের আইন কানুন বিশেষভাবে মেনে চলতে হয়েছিল। সমরকন্দের মাদ্রাসায় সরদার নামীয় সুবৃহৎ মাদ্রাসা মসজিদে আগেকার পারস্যের স্থাপত্যের পুরাপুরি নকল করা হয়েছে।

এখানেই মুসলমানেরা রং করা ও সৌন্দর্য্য রচনায় সবচেয়ে বেশী উন্নতি লাভ করেন। তবরিজের 'সবুজ মসজিদ' তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মুসলেম স্থাপত্যের যে চারটি বিভাগের বিষয় উপরে বলা হয়েছে তা ছাড়া ভারতেও মুসলমানরা হিন্দু স্থাপত্য ও মুসলেম স্থাপত্যের এক আশ্চর্য্য সমন্বয় সাধন করে' নূতন ধরণের (style) সৃষ্টি করেন। ভারতে মুসলেম স্থাপত্যের সর্ব্বসমেত তেরটি ছাঁদের (style) নাম করা যায়। পাঠানগণ যখন প্রথম রাজ্যজয় করেন, তখন তাঁরা ভারতীয় কোন ধরণের অনুকরণ না করে পারস্যের ধরনেরই অনুকরণ করেন। এ দেশের তখনকার বিশৃঙ্খল অবস্থা কোন নূতন ধরণ (style) সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী ছিল না। পারস্যের ধরনের পূর্ণ বিকাশ কুতুবমিনারে যতটা হয়েছে পারস্যের কোন এমারতেও ততটা হয় নাই। আহমদাবাদের মফিজ খানের সমাধি-মসজিদে প্রথম জৈন ও বৌদ্ধ ধরণের সঙ্গে মুসলমান আদর্শের সমন্বয় দেখা যায়। সাম্রাজ্ঞী রিজিয়া নির্ম্মিত সুলতান আলতামসের লাল পাথরের সুশোভিত সমাধি মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু ধরণ অনুকরণের একটি প্রমান। কুতুবমিনারের সুলতান আলাউদ্দিন খিলিজি নির্ম্মিত নির্ম্মিত 'আলা দরওয়াজা' সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া সমগ্র ভারতের এমনকি সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এমারতগুলির মধ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। এই এমারতগুলি দেখেই Bishop Heber লিখিয়াছেন "These Pathan built lik giants or finished their work like jewellers."

সৌধিরাণী তাজ সৃষ্টি করিয়ছিল যারা সেই মোগল যুগেই ভারতের মোসলেম স্থাপত্যের পূর্ণ বিকাশ হয়। কুতুবমিনারের কাছেই মারবল পাথরে নির্ম্মিত হুমায়ুনের সমাধি। এই এমারতের নীচে পাশাপাশি শয্যায় 'তাজ স্রষ্টা' শাজাহানের প্রিয় পুত্র দারা শাকো চির নিদ্রায় নিদ্রিত। শুধু দারা সাকোকে বক্ষে স্থান দেওয়ায় যে ইতিহাসে এই সমাধির গুরুত্ব বর্দ্ধিত হয়েছে, তা নয়, মোগল সাম্রাজ্যে স্থাপয়িতার পুত্রের এই সমাধি হইতেই শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের অসহায় পুত্রগণকে ধরে নিয়ে গুলী করে মারা হয়েছিল। দিল্লীতে সুপ্রসিদ্ধ নেজাম উদ্দিন আউলিয়ার ও তৎপার্শ্বে কবি আমির খসরু ও পিতৃগত-প্রাণা জাহানারার সমাধি স্থাপত্য হিসাবে বিশেষ কোন বিশিষ্টতা নাই। জাহানারার সমাধি মারবল পাথরে ঘেরা হলেও তাতে ঘাস জন্মিতে পারে এমন সুবিধা করে রাখা হয়েছে। সমাধি গাত্রে জাহানারার একটী স্বলিখিত কবিতা লিখে রাখা হয়েছে। তাতে লিখা আছে।"

বে গয়র ছবজা কছে না পুসেদ মাজার মারা
কে পুসদে মাজার গরিবা হামি গিয়া বছ আছত"

"শুধু সবুজ ঘাসই যেন" আমার সমাধি ঢেকে রাখে, নিরীহ ও অনহারের ঘাসই সর্ব্ব-শ্রেষ্ট আচ্ছাদন" দিল্লীতে শেরসাহ ও হুমায়ুন নির্ম্মিত 'পুরানা কিল্লার' মধ্যে শেরসাহের মসজিদে ও শেরমণ্ডল নামে দুটি এমারত দেখা যায়। পাঠান হতে ক্রমে মোগল ধরণের বিকাশের নমুনা প্রথমে শেরসাহের মসজিদে পাওয়া যায়। শের মণ্ডল হুমায়ুনের লাইব্রেরী বলেই

সুপরিচিত। এই লাইব্রেরীর সিঁড়ি হতে পড়ে হুমায়ুন মারা গিয়াছেন। শাজাহান দিল্লীর 'লাল কিলা' নির্ম্মাণ করেন। লাল কিলার মধ্যে দেওয়ান এ সাম, দেওয়ানে খাস্ ও স্নানাগার গুলির নির্ম্মাণ ও সাজসজ্জা এতই মনোরম যে এখানে বিলাশিতার চরম নিদর্শণ পাওয়া যায়। দেওয়ানে খাসের দেয়াল গাত্রে এই প্রসিদ্ধ কবিতাটি খোদিত আছে :—

"আগর ফেরদউস বর রুয়ে জমি আছত"
হমি আছত ও হমি আছত ও হমি আছত'

আগ্রার এমারতগুলির মধ্যে শাজাহানের 'জামে মসজিদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত মতি মসজিদের মত এমন নিখুঁত উপাসনালয় তৈরী হয় নাই। মানুষের শক্তির পূর্ণতা এইখানে অনেকটা দেখা যায়। আকবর যে নূতন ধরণের প্রবর্ত্তন করেন জাহাঙ্গীরের মহলে তার পূর্ণ বিকাশ হয়। মার্ব্বল পাথরে নির্ম্মিত বিশ্রামাগার সুদৃশ্য 'তমন বুরজ' এর সঙ্গেই "দেওয়ানে খাস" অবস্থিত। দেওয়ানে খাসকে miracle, of beauty" বলা হয়। এর সঙ্গেই দেওয়ানে আম ও হেরেমের মহিলাদের উপাসনালয় নগিনা মসজিদে। তাজমহল নির্ম্মানে পারস্যের আদর্শের অনুকরণ করা হয়েছে। তাজের পরিকল্পনার (plan) দিক চেয়ে তার সৌন্দর্য্যের দিকই দেখতে হয় বেশী করে। প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি এই তাজই মোগল শিল্পের শেরা। সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া তাজের সমকক্ষ কোন এমারত দুনিয়াতে আর নাই। তাজ প্রাণহীন ইট পাথরের হলেও মনে হয় যেন জীবন্ত মমতাজের রূপ পরিগ্রহ করে যমুনা পার গোলজার করে আছে। ভারতীয় মুসলেম স্থাপত্যের কথা বলতে গেলে আকবরের 'Romace in stone' ফতেপুর-সিক্রির কথা বলাই সব চেয়ে দরকার। ভারতের জাতীয়তার তীর্থক্ষেত্র এই ফতেপুর-সিক্রিতে আকবর নিজের কল্পনার জীবন্ত মূর্ত্তি দিতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর তৈরী এমারতগুলির মধ্য দিয়া। এই খানেই তিনি ইট পাথরের গাথুনিতে হিন্দু ও Saracenic style এর সমন্বয় সাধন করে উৎকর্ষের (কালচারের) দিক দিয়া হিন্দু মুসলমান মিলন সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করেছিলেন। এইখানেই আকবর হিন্দুধর্ম্ম ও ইসলামের সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর নূতন ধর্ম্ম 'দীন-এ-ইলাহি' প্রবর্ত্তন করে এইখানেই আকবর বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনা মূলক সমালোচনার সূত্রপাত করে "the first student of comparative relegion" উপাধি লাভ করেছিলেন। আবুল ফজল বাস্তবিকই লিখেছিলেন 'Splendid edifices and crences the work of his mighty heart in the garments of stone clay" সলিম বিশতির স্মৃতি রক্ষার্থে নির্ম্মিত ফতেপুর-সিক্রির জুমা মসজিদের ফটক 'বুলন্দ দরওয়াজা' পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফটক। ইহা ১৭৬ ফিট উচ্চ, ইহার চূড়া হতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী তাজমহল পর্য্যন্ত দেখা যায়। হাস্য-রসিক সুপুরুষ জন্য নির্ম্মিত প্রাসাদ ও যোধবাইর মহল সম্পূর্ণ হিন্দু ধরণে নির্ম্মিত; কিন্তু তাঁদের সৌন্দর্য্য রচনা পারস্যের অনুকরণ করা হয়েছে সুলতানার মহল ফতেপুর সিক্রির

মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর প্রাসাদ। কররবলের প্রাসাদের কাছে পাঁচ মহল* নামীয় পাঁচতালা রংমহল, দেওয়ানে খাছ, দেওয়ানে আম, ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও কবি ফৈজির প্রাসাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কুমার সেলিমের জন্মরহস্যের সঙ্গে বিজড়িত এই ফতেপুর সিক্রিতে নও-রোজের মেলায় নূরজাহানের সঙ্গে সেলিমের প্রথম প্রেম সঞ্চার হয়। বালক সেলিম কয়েকটি পায়রা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে ফোয়ারা পার্শ্বে উপবিষ্টা বালিকা মেহের-উন্ নিসাকে দুটি পায়রা ধরতে দিয়ে অবশিষ্টগুলো নিয়ে খেলতে চলে যান; ফিরে এসে যখন দেখলেন যে বালিকা মেহের উন্-নিসায় হাতে মাত্র একটি পায়রা রয়েছ তখন রাগ করে জিজ্ঞাসা করলেন 'অন্য পায়রাটি কি রকমে চলে গেল।' মেহের তখন হাতের পায়রাটি আকাশে ছেড়ে দিয়ে বল্লেন 'এই রকম।' বালিকার এই নির্ভীক অথচ সরল রসিকতায় সেলিমের ভাব পরিবর্ত্তন হয় এবং তিনি মেহেরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিতে সম্পূর্ণ হিন্দু ধরণের অনুকরণ করা হয়েছে। আকবরের পর মোগলেরা আবার পারস্যের ধরণের অনুকরণ আরম্ভ করেন। শাজাহান নির্ম্মিত 'ইতমদুদ দৌলাতে' এই পরিবর্ত্তনের পূর্ণতা দেখা যায়।

এ প্রবন্ধে মুসলেম স্থাপত্য সম্বন্ধে একটী সাধারণ জ্ঞান সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। মুসলমান প্রধান্যের যুগে সভ্যতার প্রত্যেক স্তরে মানুষের জীবন কি রকম পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল তা আমরা আজ যেমন জানি না, ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি বিষয়েও আমাদের কোন পরিষ্কার ধারণা নাই। এ নিদ্রিত সমাজ জীবন-সংগ্রামে আজ সব দিকে পরাজিত হচ্ছে। হয়তঃ তার লুপ্ত গৌরব তাকে তার ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে দিতে পারবে, এই ভরসাতেই এ প্রয়াস। ইউরোপ যখন স্থাপত্য বিস্তায় উদাসীন ছিল, মুসলমানেরা তখন বাগদাদ, দামস্ক ও অন্যান্য নগরে শিক্ষাকেন্দ্র সৃষ্টি করে ও গ্রীক লেখকদের বহির অনুবাদ করে নূতন সৃষ্টির গৌরবে জগতকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। Rivoria লিখিয়াছেন "The richness progress of arabic art at a period when architecture had sunk to the lowest eble throughut Europe is due in great measure to the establishment of the learned academies of Damascass, Bagdad, other principal cities and to the revival of academic learning by the translation of the works of Greek authors—এই সব শিক্ষাকেন্দ্র আজ আর নাই। শিক্ষার সে স্পৃহা ও মুসলমানদের মধ্যে নাই। তার সেদিন আর এদিনে কত প্রভেদ!

মোসলেম ভারতে শিক্ষা চর্চ্চা

(খান মোহাম্মদ আতাউর রহমান)

ভারতের মুসলমান বাদশাহদের কথা মনে পড়িলেই হয় তাঁহাদের যুদ্ধ-প্রিয়তা না হয় সুখ-প্রিয়তার দৃশ্যই চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। অন্ততঃ স্কুল-কলেজের পাঠ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া আমরা তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্য আক্রমণ ধ্বংসের মধ্যেই পর্য্যবসিত দেখিতে পাই। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে সাধারণতঃ তাঁহাদের জীবনের কুৎসিত দিকটাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহারা ভারতের হিন্দু মুসলমানের জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি কল্পে কিরূপ উৎসুক ও বদ্ধ-পরিকর ছিলেন তাহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়াইতে পারিবেনা।

সুলতান মহম্মদ ঘোরির ভারতের সিংহাসন আরোহণের পর হইতেই প্রকৃত পক্ষে ভারতের মুসলমানদের শিক্ষা আরম্ভ হয়—তাঁহার পূর্ব্বে এবং তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে ও ভারতের মুসলমানদের একটা dark period ছিল কিন্তু মহম্মদ ঘোরি অতিশয় যত্ন ও উদ্যমের সহিত মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা চর্চ্চার পথ সহজ ও সুগম করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি বিনষ্ট করিয়া তথায় মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম-প্রচার এবং রাজ্য বিজয়ের দুন্দুভিনাদের মধ্যে ও তিনি শিক্ষা-বিস্তারের কথা ভুলেন নাই। তৎপর সুলতান কুতুবউদ্দিন অসংখ্য মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিক্ষা চর্চ্চার প্রবল উৎসাহ দান করেন। তাঁহার সময়ে এবং পরবর্ত্তী সময়েও মাদ্রাসা ও মসজিদ এক সঙ্গে নির্ম্মাণ করা হইত। এবং তথায় ধর্ম্ম ও শিক্ষাচর্চ্চা হইত। কুতুবউদ্দিনের পর সুলতান আলতামাসের রাজত্বকালে তিনি রাজকার্য্যে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া শিক্ষা দীক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিতে পারিতেননা এবং অবসর-কালে ও শিক্ষা বিস্তারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্বানের যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং তাঁহার দরবারে বহু সংখ্যক বিদ্বান ও কবি ছিলেন। তাঁহার যত্ন ও আগ্রহে তাঁহার কন্যা সুলতানা রাজিয়া শৈশবকাল হইতেই শিক্ষা লাভ করেন এবং যৌবনে যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ও শিক্ষাচর্চ্চার জন্য ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। দিল্লীতে তিনি মুয়াইজ্জী বিদ্যালয় নামে একটা প্রকাণ্ড বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সুলতানা নিজে কোরাণ ও হাদিসে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং অবসর কালে অধিকাংশ সময়ই সাহিত্য আলোচনা বা চর্চ্চায় মগ্ন থাকিতেন। সুলতান নাসিরউদ্দিন নিজে বিদ্বানছিলেন এবং বিদ্বানদের সমাদর করিতেন। তাঁহার বিশ বৎসর রাজত্বকালে তিনি মুসলমানদের ক্রমোন্নতির জন্য স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শৈশবে তিনি সাধারণ ছাত্রদের মত কঠোর জীবন যাপন করিতেন এবং পরে

সিংহাসন আরোহণ করিলে পর ও তিনি ছাত্রদের ন্যায়ই সাধারণভাবে থাকিতেন। তাঁহার নিজের লেখনী দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন। প্রসিদ্ধ ভূপর্য্যটক ইবনে বতুতা একশত বৎসর পরে ভারতে আসিয়া তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত একখণ্ড কোর-আন পাঠে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে চেঙ্গিসখান ভারতের উত্তর পশ্চীম সীমান্তে ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ করেন। তাঁহার ভয়ে খোরাসানের ১৫।১৬ জন শাসন কর্ত্তা দিল্লীতে আগমন করিয়া সুলতানের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। সুলতান তাঁহাদিগকে অত্যন্ত যত্ন ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। উক্ত শাসন কর্ত্তাদের পারিষদবর্গের মধ্যে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের আগমনে দিল্লী এক সময়ে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র হইয়া পড়ে। তাঁহার রাজত্বকালে সৈয়দ মৌলা নামক একজন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি দিল্লীতে একটী মাদ্রাসা স্থাপন করেন। সুলতান বলবন বহু সংখ্যক সাহিত্য সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র সুলতান মুহম্মদ নিজে একজন কবি ছিলেন। শৈশবে প্রসিদ্ধ কবি আমির খসরু তাঁহার গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে তিনি অতি অল্প বয়সেই কাব্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন এবং প্রসিদ্ধ কবিদের কাব্যগ্রন্থ হইতে আনুমানিক বিশ সহস্র বয়েত সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। পিতার ন্যায় ইনিও সাহিত্য-সমিতির গঠন কার্য্যে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেন এবং বহু সংখ্যক সাহিত্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রসিদ্ধ নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা ও কথকগণকে এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করেন। এই সকল সমিতিতে নানা বিষয়ের আলোচনা করে মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করা হইত। এবং কবি আমির খসরু সভায় সভাপতিত্ব করিতেন। সুলতান মহমুদ কবিদের বিশেষ সমাদার করিতেন। পারস্যের মহাকবি সেখ সাদিকে ভারতবর্ষে আনিবার জন্য তিনি দুই দুই বার দূত প্রেরণ করিয়া নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু বিশেষ কারণে সেখ সাদি সুলতানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। যুদ্ধে গমন কালেও সুলতান অনেক বিদ্বান ব্যক্তি এবং বহুসংখ্যক পুস্তক সঙ্গে লইতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষে এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন এক কবি খসরু বন্দী হন।

অতঃপর খিল্‌জি বংশের প্রথম সুলতান জালালউদ্দিন খিল্‌জির সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চর্চ্চার গতির পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি বিদ্বানদের অত্যন্ত সম্মান সমাদর করিতেন। আমির খুসরুকে তিনি দিল্লী Imparial library র অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার জামাতা আলাউদ্দিন খিল্‌জি নিরক্ষর ছিলেন এবং রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি নিজের অজ্ঞানতার কথা বুঝিতে পারিয়া গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পারসী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষার প্রভাবে তিনি শীঘ্রই স্থানে স্থানে মাদ্রাসা বা বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ দেন। এবং ভিন্ন দেশ হইতে বহু বিদ্বানদিগকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়াদিতে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে ধর্ম্ম চর্চ্চা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে।

তাঁহার আদেশে বহুসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজ নিজ অর্থব্যয়ে স্থানে স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই সময়ে দিল্লীতে এমন অনেক বিদ্বান ছিলেন যাঁহারা বোখারা, বগদাদ, কাইরো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিক্ষাস্থলের খ্যাতনামা বিদ্বানদের অপেক্ষাও অধিক জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন। তাঁহারই সময়ে কবির উদ্দীন ফতেহ-নামা নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুলতান আলাউদ্দীনের সময় ভারতবর্ষে কয়েকজন খ্যাতনামা জ্যোতিষও ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সময়ে অসংখ্য বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তি থাকিতেও সুলতান তাঁহাদের সকলের উপযুক্ত সম্মান করেন নাই। ইঁহাদের জ্ঞান ও প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান করিলে, সুলতান আলাউদ্দীনের নাম শিক্ষাজগতের ইতিহাসে স্থান পাইত।

সুলতান আলাউদ্দীনের সময় হইতে মিশ্র ভাষার প্রচলন হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির Intermingling আরম্ভ হয়।

খিলজী বংশের পতনের পর বংশের প্রথম তোগলক সুলতান গিয়াসুদ্দীনের সময় শিক্ষা-রাজ্যে পুনরায় যুগান্তর আরম্ভ হয়। তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গ খুব পছন্দ করিতেন এবং তাহাদিগকে দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। তৎকালে শেখ ও সৈয়দ এই দুই বংশই জ্ঞান বিজ্ঞানে অত্যধিক উন্নত ছিলেন। সুলতান তাঁহাদিগকে বার্ষিক বৃত্তি দান করিতেন এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার সহায়তা করিতেন।

তাঁহার পুত্র মাহমুদ তুগলকের সময় শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। তিনি শৈশব কাল হইতেই উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত শিক্ষাচর্চ্চা আরম্ভ করেন এবং যৌবনে কাব্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। ভাষার সরলতা ও ভাবের গভীরতায় তিনি তৎকালীন অনেক কবির উপরে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। স্মরণ-শক্তি তাঁহার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। তর্কে তাঁহাকে পরাস্ত করা কঠিন ছিল। যে কোন বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিককে তিনি যুক্তি তর্কে পরাস্ত করিতে পারিতেন। হস্তাক্ষর তাঁহার অতি সুন্দর ছিল। চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও তর্ক শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি উপাখ্যান বা রোমান্সে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার নানাবিধ গুণের কথা শুনিয়া এশিয়ার খ্যাতনামা বিদ্বানগণ দিল্লীতে আগমন করেন। দিল্লী হইতে তিনি রাজধানী দেওগিরিতে স্থানান্তরিত করিয়া দিল্লীর ধ্বংস সাধন করেন। এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী দৌলতাবাদে তিনি অনেক বিদ্বান ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া যান কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তথাকার জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন—এবং অনেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই কারণে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা চর্চ্চার প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন। কথিত আছে সুলতানের দরবারে প্রায় এক হাজার কবি এবং বার শত হাকিম ছিলেন। তাঁহার আহারের সময় দুই শত আইনজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে বসিতেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। প্রসিদ্ধ ভূপর্যাটক ইব্নে বতুতা তাঁহার সময়ে ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। সুলতান অত্যন্ত সমাদর করিয়া তাঁহাকে

দরবারে নিমন্ত্রণ করেন। সুলতান মুহম্মদের স্বভাবে নিষ্ঠুরতা ও ক্রোধ না থাকিলে তিনি ভারতের মুসলমানদিগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে জগতের যে কোন জাতির সমকক্ষ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পরবর্ত্তী বাদশাহ ফিরোজশাহ তোগলক তাঁহার রাজধানী ফিরোজাবাদের গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ফিরোজ শাহ নিজে অত্যন্ত শিক্ষিত ছিলেন এবং নিজ জীবন-চরিত "ফতু-হাতে ফিরোজশাহী" লিখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস অধ্যয়নে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বার্ণি এবং সিরাজ আফীফ তাঁহার দরবারে ছিলেন। বার্ণির মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ কোন ঐতিহাসিকের দ্বারা তাঁহার রাজত্বের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করাইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী কোন ঐতিহাসিক না পাওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। অগত্যা তিনি তাঁহার জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া সেগুলি, কুশ্‌কী-শিকার ও কুশ্‌কী-মুজুগ, নামক দুইটি প্রাসাদের গুম্বুজের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিশিষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। তিনি জীবনে প্রচুর অর্থ শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৩৬ লক্ষ টাকা বিদ্বান ব্যক্তিদের বৃত্তির জন্য দান করিয়াছেন।

ফিরোজ শাহের অসংখ্য ক্রীতদাস ছিল তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্রীতদাসকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। কেহ কেহ কোরাণ পাঠ এবং মুখস্থ করিতে—কেহ কেহ শুধু ধর্ম্মালোচনা করিতে—এবং কেহ পুস্তকাদি নকল করিতে নিযুক্ত হইত। একদল ক্রীতদাসকে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার জন্য তিনি বণিকদের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই প্রকারে প্রায় ১২০০০ হাজার ক্রীতদাস ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-বিভাগে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করে। তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক লোক নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পৃথক কোষাগার ছিল। ক্রীতদাসদের শিক্ষার জন্য এতদূর যত্ন অন্য কোন সুলতান বা সম্রাট করেন নাই। তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী সুলতানদের জন্য এক আইন জারী করেন যে প্রজাবৃন্দের শিক্ষা বিস্তার ও উন্নতি সাধন সাম্রাজ্যের একটি বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে এবং এ বিষয়ে কেহ অবহেলা করিলে তিনি রাজধর্ম্মের অসম্মানী করিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ফতেহ খানের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতি চিহ্নার্থে তিনি কদম শরীফ নামক একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ফিরোজাবাদে তিনি বিখ্যাত ফিরোজশাহী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মাদ্রাসার সৌন্দর্য্য তৎকালে অতুলনীয় ছিল। প্রসিদ্ধ সাধক-কবি মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমী এই মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন। কোরাণ, তফসীর, ফেকা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ ছাত্রদের দ্বারা বিশেষরূপে আয়ত্ত করাইতেন। ছাত্রদের জীবনে শুধু পার্থিব শিক্ষাই যথেষ্ট ছিল না, ধর্ম্মশিক্ষাও শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য একই আবাস ছিল। ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত বিদ্বান-মণ্ডলীর অভ্যর্থনার জন্য মাদ্রাসায় একটি প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট